اشراق

Ishraq USA | Bangla Edition

ইশরাক বাংলা সংস্করণ। জুন ২০২৬

আল-ইশরাক

বাংলা

সম্পাদক: মাওলানা উমর ফারুক

সম্পাদনা পরিষদ:

মঞ্জুর এলাহী

হুমায়ুন কবির

মোহাম্মদ সিয়াম হোসেন

ইমদাদ হোসেন

GHAMIDIBANGLA.COM

اشراق
Ishraq USA | Bangla Edition
ইশরাক বাংলা সংস্করণ। জুন ২০২৬

আল-ইশরাক

বাংলা

সূচিপত্র

১) কুরআনের তরজমা : সুরা বাকারা [১৭-২২] ৩

২) দরসে হাদিস : নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর তাওহিদের দাওয়াত দেওয়া এবং সাহায্য তালাশ করা। ৬

৩) ইসলাম ও নারী: নারীর সত্তা ১২
: নারীদের ব্যাপারে প্রচলিত ভুলধারণা ২৩

৪) জীবন ও কর্ম: জ্ঞানের তিন ধ্রুবতারা ৩৫

৪) সাক্ষাৎতার: ইসলাম ও মুসলিমদের ইতিহাস, মৌলিক বই ও বরেণ্য ব্যক্তিত্ব – নাইম আহমেদ বালুচ-এর একান্ত সাক্ষাৎকার ৪২

৫) ধারাবাহিক বই: বাইবেলে মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসন্ধান ৭৯

৬) সাহিত্য : কবিতা ৯০

Ghamidi Center of Islamic Learning
www.ghamidi.org
AN INITIATIVE OF AL-MAWRID US.

সুরা বাকারা

জাভেদ আহমেদ গামিদি

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُۥ ذَهَبَ
ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِى ظُلُمَٰتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ١٧ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ
فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٨ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَٰتٌ وَرَعْدٌ
وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَٰبِعَهُمْ فِىٓ ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَٰعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ
وَٱللَّهُ مُحِيطٌۢ بِٱلْكَٰفِرِينَ ١٩ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَٰرَهُمْ كُلَّمَآ
أَضَآءَ لَهُم مَّشَوْا۟ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا۟ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ
لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَٰرِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ٢٠

(১৭) তাদের উদাহরণ হচ্ছে, যেন (অন্ধকার রাতে) কোনো ব্যক্তি আগুন জ্বালালো, এরপর সেই আগুন যখন তার আশপাশ আলোকিত করে তুললো, তখন যাদের জন্য আগুন জ্বালানো হয়েছিল, আল্লাহ তাদের আলো নিয়ে গেলেন এবং তাদেরকে এমন ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিলেন যে, তারা কিছুই দেখতে পায় না।

(১৮) এরা বধির, বোবা ও অন্ধ; তাই এখন আর তারা কিছুতেই ফিরবে না।

(১৯) অথবা যেন আকাশ থেকে বৃষ্টি হচ্ছে; যাতে রয়েছে ঘোর অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ চমক।মৃত্যুর ভয়ে বজ্রধ্বনিতে তারা কানে আঙ্গুল গুঁজে দিচ্ছে। বাস্তবতা হচ্ছে এ ধরনের অস্বীকারকারীদেরকে আল্লাহ সব দিক থেকে বেষ্টন করে রেখেছেন।

(২০) বিদ্যুৎ চমক তাদের চোখগুলো ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। যখনই তাদের সামনে বিদ্যুৎ চমকে ওঠে, তখনই তারা তাতে একটুখানি হেঁটে নেয়: আর যখন তাদের উপর অন্ধকার ছেয়ে যায়, তখন তারা দাঁড়িয়ে থাকে। আল্লাহ যদি চাইতেন, তাহলে অবশ্যই তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি হরণ করতে পারতেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٢١ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٢

(২১) হে মানুষেরা! (এদের পেছেনে লেগে থেকে তোমরা কেন নিজেদের ধ্বংস করছো?) তোমরা নিজেদের সেই প্রভুর বন্দেগি করো, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরও সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা (তাঁর শাস্তি থেকে) বাঁচতে পারো।

(২২) (তিনিই তো সেই সত্তা) যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ বানিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তারপর এর দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য বিভিন্ন ধরনের ফল-ফলাদি উৎপন্ন করেছেন। সুতরাং এ বিষয়গুলো জানা সত্বেও তোমরা আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করিও না।

দরসে হাদিস

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর তাওহিদের দাওয়াত দেওয়া এবং সাহায্য তালাশ করা

মুহাম্মদ রফি মুফতি

—১—

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عِبَادٍ الدِّيلِيِّ، وَكَانَ جَاهِلِيًّا أَسْلَمَ، فَقَالَ:[1] رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصُرَ عَيْنِي بِسُوقِ ذِي الْمَجَازِ، [وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، وَهُوَ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا»][2]، وَيَدْخُلُ فِي فِجَاجِهَا وَالنَّاسُ مُتَقَصِّفُونَ عَلَيْهِ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَقُولُ شَيْئًا، وَهُوَ لَا يَسْكُتُ، يَقُولُ: «أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا» إِلَّا أَنَّ وَرَاءَهُ رَجُلًا أَحْوَلَ وَضِيءَ الْوَجْهِ، ذَا غَدِيرَتَيْنِ [يَرْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ، وَقَدْ أَدْمَى عُرْقُوبَيْهِ وَكَعْبَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تُطِيعُوهُ، فَإِنَّهُ كَذَّابٌ][3]، [4]، [إِنَّ هَذَا يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَنْ آلِهَتِكُمْ][5]، [6]، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ يَذْكُرُ النُّبُوَّةَ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا الَّذِي يُكَذِّبُهُ؟ قَالُوا: عَمُّهُ أَبُو لَهَبٍ،[7] قُلْتُ: إِنَّكَ كُنْتَ يَوْمَئِذٍ صَغِيرًا، قَالَ: لَا وَاللَّهِ، إِنِّي يَوْمَئِذٍ لَأَعْقِلُ.

রাবিয়া বিন ইবাদ দিলি (রাদিয়াল্লাহু আনহু), যিনি জাহেলিয়াতের কিছু সময়ও পেয়েছিলেন এবং পরে মুসলমান হয়ে যান, তিনি বলেন: আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে নিজের চোখে জিল-মাজাজ নামক বাজারে দেখেছি, তিনি লাল রঙের পোশাক পরিহিত ছিলেন এবং তিনি বলতে বলতে যাচ্ছিলেন: হে লোকসকল, মেনে নাও: "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই", তোমরা সফল হবে। তিনি বাজারের বিভিন্ন গলিতে প্রবেশ করছিলেন এবং মানুষ তার চারপাশে জমা হচ্ছিল, কিন্তু আমি কাউকে (তার সাথে) কোনো কথা বলতে দেখিনি এবং (অন্য দিকে) তিনি ছিলেন এমন যে, চুপ না হয়ে বারবার বলে যাচ্ছিলেন: হে লোকসকল, মেনে নাও: "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই", তোমরা সফল হবে।[১] তবে তার পিছনে উজ্জ্বল চেহারা এবং দুই ঝুঁটিবিশিষ্ট একজন টেরা চোখা লোক চলছিল। সে তাকে পাথর মারছিল, এমনকি তার গোড়ালি ও নলার ওপরের অংশ রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল এবং সে মানুষকে বলছিল: এর কোনো কথা মেনো না, এ বড় মিথ্যাবাদী, এই লোক তোমাদের উপাস্যদের থেকে বিমুখ করে তোমাদেরকে তাদের থেকে বিরত রাখতে চায়। আমি মানুষকে জিজ্ঞেস করলাম: ইনি কে? মানুষ জানাল: ইনি মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ, যিনি নিজের নবুয়তের দাবি করেন, তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম: একে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী এই ব্যক্তি কে? তারা বলল: এটা তার চাচা আবু লাহাব।[২] (আব্দুল্লাহ বিন জাকওয়ান নামক বর্ণনাকারী বলেন): আমি (রাবিয়াকে) বললাম: আপনি তো সেই সময় কম বয়সী ছিলেন? তিনি বললেন: না, আল্লাহর কসম, আমি সেই সময় বুঝ-জ্ঞান রাখতাম।

১. নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দাওয়াতের দ্বিতীয় পর্যায়ে আল্লাহতায়ালা যখন তাকে সাধারণ সতর্কীকরণের নির্দেশ দিলেন, তখন এর জন্য নিজের পরিস্থিতি অনুযায়ী তিনি যে সমস্ত পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, এটা তারই বিবরণ।

২. সত্যের দাওয়াতের বিরোধিতায় আবু লাহাবের এই আচরণের কারণে কুরআনে বিশেষভাবে তার ব্যাপারে সেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছে, যাতে তার এবং তার সাহায্যকারী ও বন্ধুদের ধ্বংসের সংবাদ দেওয়া হয়েছে।

মূল আরবি টেক্সটের টীকা—

[1]. এই রেওয়ায়েতের মূল পাঠ মুসনাদে আহমদ, রেওয়ায়েত নম্বর: ১৬০২৩ থেকে নেওয়া হয়েছে। এর বর্ণনাকারী রাবিয়া বিন ইবাদ দিলি (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। এর মুতাবাআত তথা সমর্থনকারী বর্ণনা এই গ্রন্থগুলোতে রয়েছে: মুসনাদে আহমদ, রেওয়ায়েত নম্বর: ১৬০২০, ১৬০২১, ১৬০৬৯। আশআস বিন সুলাইম থেকে এর শাওয়াহিদ মুসনাদে আহমদ, রেওয়ায়েত নম্বর: ১৬৬০৩, ২৩১৫১-এ দেখা যেতে পারে। তারিক বিন আব্দুল্লাহ আল-মুহারিবী থেকে এর শাওয়াহিদ এই কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে: সহিহ ইবনে খুজাইমা, রেওয়ায়েত নম্বর: ১৫৯। সহিহ ইবনে হিব্বান, রেওয়ায়েত নম্বর: ৬৫৬২।

[2]. সহিহ ইবনে হিব্বান, রেওয়ায়েত নম্বর: ৬৫৬২।

[3]. সহিহ ইবনে হিব্বান, রেওয়ায়েত নম্বর: ৬৫৬২।

[4]. কোনো কোনো রেওয়ায়েতে, যেমন মুসনাদে আহমদ, রেওয়ায়েত নম্বর: ১৬০২০-এ এই ঘটনা এই শব্দে বর্ণিত হয়েছে:

رَأَيْتُ أَبَا لَهَبٍ بِعُكَاظٍ، وَهُوَ يَتْبَعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هَذَا قَدْ غَوَى، فَلَا يُغْوِيَنَّكُمْ عَنْ آلِهَةِ آبَائِكُمْ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفِرُّ مِنْهُ، وَهُوَ عَلَى أَثَرِهِ.

“আমি আবু লাহাবকে উকাজ বাজারে দেখেছি যে, সে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পিছু নিচ্ছিল এবং বলছিল: হে লোকসকল, এই ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, (সতর্ক হয়ে যাও) এ যেন তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদার উপাস্যদের বিরুদ্ধে উস্কে না দেয়। (আমি দেখলাম যে), আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে এড়িয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছিলেন এবং সে তার পিছনে লেগে ছিল।”

[5]. মুসনাদে আহমদ, রেওয়ায়েত নম্বর: ২৩১৫১।

[6]. কোনো কোনো রেওয়ায়েতে, যেমন মুসনাদে আহমদ, রেওয়ায়েত নম্বর: ১৬০২১-এ إِنَّ هَذَا يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَنْ آلِهَتِكُمْ-এর পরিবর্তে এই শব্দগুলো রয়েছে: لَا يَصُدَّنَّكُمْهَذَا عَنْ دِينِ آلِهَتِكُمْ (এ যেন তোমাদেরকে তোমাদের উপাস্যদের ধর্ম থেকে কোনোভাবেই বিরত রাখতে না পারে)।

[7]. কোনো কোনো রেওয়ায়েতে, যেমন মুসনাদে আহমদ, রেওয়ায়েত নম্বর: ১৬৬০৩-এ আবু লাহাবের পরিবর্তে আবু জেহেলের উল্লেখ রয়েছে।এর শব্দগুলো এরূপ:

يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا»، قَالَ: وَأَبُو جَهْلٍ يَحْثِي عَلَيْهِ التُّرَابَ وَيَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَا يَغُرَّنَّكُمْهَذَاعَنْدِينِكُمْ، فَإِنَّمَا يُرِيدُ لِتَتْرُكُوا آلِهَتَكُمْ، وَتَتْرُكُوا اللَّاتَ وَالْعُزَّى، قَالَ: وَمَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“নবীজি বলছিলেন: হে লোকসকল, মেনে নাও: “আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই”, তোমরা সফল হবে।বর্ণনাকারী বলেন: আবু জেহেল নবীজির ওপর মাটি ছুঁড়ে মারছিল এবং বলছিল: হে লোকসকল, নিজেদের ধর্মের ব্যাপারে এই ব্যক্তির ধোঁকায় পড়ো না। এ তো কেবল এটাই চায় যেন তোমরা তোমাদের উপাস্যদের ছেড়ে দাও, লাত এবং উজ্জাকে ছেড়ে দাও।বর্ণনাকারী বলেন: সে এটা বলছিল, কিন্তু আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপই করছিলেন না।”

—২—

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:[1] مَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، يَتْبَعُ النَّاسَ فِي مَنَازِلِهِمْ بِعُكَاظٍ وَمَجَنَّةَ، وَفِي الْمَوَاسِمِ بِمِنًى، [يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ بِالْمَوْقِفِ فَيَقُولُ][2,3]: «مَنْ يُؤْوِينِي؟ مَنْ يَنْصُرُنِي حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالَةَ رَبِّي، وَلَهُ الْجَنَّةُ؟ [فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي»][4] [فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يُؤْوِيهِ وَيَنْصُرُهُ][5] حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ، أَوْ مِنْ مِصْرَ ـ كَذَا قَالَ ـ فَيَأْتِيهِ قَوْمُهُ، فَيَقُولُونَ: احْذَرْ غُلَامَ قُرَيْشٍ، لَا يَفْتِنُكَ، وَيَمْشِي بَيْنَ رِجَالِهِمْ، وَهُمْ يُشِيرُونَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ.

জাবের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে রেওয়ায়েত রয়েছে, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (নিজের প্রকাশ্য দাওয়াতের) দশ বছর মক্কায় অবস্থান করেন। (এই সময়ের মধ্যে মক্কা এবং তার নিকটবর্তী) উকাজ ও মাজান্নাহ-এর বাজারগুলোতে মানুষের তাঁবুতে এবং হজ্জের মৌসুমে মিনার ময়দানে যেতেন। তিনি সেখানে তাদের অবস্থানস্থলগুলোতে নিজেকে তাদের সামনে পেশ করতেন এবং বলতেন: (তোমাদের মধ্যে) কে আছে, যে আমাকে আমার প্রতিপালকের বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য আশ্রয় দেবে এবং আমাকে সাহায্য করবে? (আল্লাহর কাছে) এর প্রতিদান হবে জান্নাত। (এখানে) কুরাইশরা আমাকে আমার প্রতিপালকের বাণী পৌঁছে দেওয়া থেকে বিরত রেখেছে, কিন্তু নবীজি এমন একজন ব্যক্তিও পেতেন না, যে তাকে আশ্রয় দিত এবং তাকে সাহায্য করত। সুতরাং পরিস্থিতি এখানে গিয়ে পৌঁছেছিল যে, যদি কখনো কোনো ব্যক্তি ইয়েমেন বা মিসর থেকেও আসত — (বর্ণনাকারী) এটাই বলেছিলেন — তখন তার নিজের লোকেরাই এসে তাকে বোঝাত: তুমি কুরাইশের এই যুবক থেকে বেঁচে থেকো, এ যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। (নিজের দাওয়াত পেশ করার সময়) নবীজি যখন ওই লোকদের মাঝখান দিয়ে যেতেন, তখন তারা (নিজেদের বিস্ময় এভাবে প্রকাশ করত যে), আঙুল তুলে তুলে তার দিকে ইশারা করত।

১. নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিজরত ও সম্পর্কচ্ছেদের পর্যায়ে নিজের দাওয়াত এই পদ্ধতিতে পেশ করেছেন। এর অর্থ ছিল, এখন সেই সময় এসে গেছে যখন নবীজির জন্য কোনো হিজরতের স্থান পাওয়া যাবে অথবা তার প্রতিপালক তাকে নিজের কাছে তুলে নেবেন এবং আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তার সম্প্রদায়ের ফয়সালা করা হবে। সিরাতের রেওয়ায়েতসমূহ থেকে জানা যায় যে, নবীজির দাওয়াতে এই পর্যায় তায়েফ সফর থেকে ফিরে আসার পর থেকে শুরু হয়েছে। সুতরাং এ ধরনের একটি ঘটনা মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, রেওয়ায়েত নম্বর: ৩৬৫৮২-এ হামদানের এক ব্যক্তির ব্যাপারেও বর্ণিত হয়েছে যে, নবীজি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন: তোমার সম্প্রদায় কি আমার হেফাজতের জন্য আমার সাহায্যকারী হতে পারে?

সে বলেছিল: হ্যাঁ, অবশ্যই।কিন্তু তারপর তার কিছুটা দ্বিধা হলে সে এটা বলে নবীর কাছ থেকে বিদায় চাইল যে, আমি আমার এলাকায় যাই এবং আপনার দাওয়াত আমার সম্প্রদায়ের সামনে পেশ করি।আপনার সাথে আগামী বছর এসে দেখা করব।

মূল আরবি টেক্সটের টীকা

[1]. এই রেওয়ায়েতের মূল পাঠ মূলত মুসনাদে আহমদ, রেওয়ায়েত নম্বর: ১৪৪৫৬ থেকে নেওয়া হয়েছে। এর বর্ণনাকারী জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। এর মুতাবাআতসমূহ এই সমস্ত উৎসে উদ্ধৃত হয়েছে: মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, রেওয়ায়েত নম্বর: ৩৬৫৮২।মুসনাদে আহমদ, রেওয়ায়েত নম্বর: ১৪৪৫৭, ১৪৪৫৮, ১৪৬৫৩, ১৫১৯২। সুনানে দারেমি, রেওয়ায়েত নম্বর: ৩৩৯৭। সুনানে ইবনে মাজাহ, রেওয়ায়েত নম্বর: ২০১। সুনানে তিরমিজি, রেওয়ায়েত নম্বর: ২৯২৫। আস-সুনানুল কুবরা, নাসায়ি, রেওয়ায়েত নম্বর: ৭৬৮০। আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি, রেওয়ায়েত নম্বর: ৬৮৪৭।মুস্তাদরাকে হাকেম, রেওয়ায়েত নম্বর: ৪২২০।শারহু উসুলিল ইতিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআত, রেওয়ায়েত নম্বর: ৫৫৫, ১৪২১। আল-আসমাহ ওয়াস সিফাত, বায়হাকি, রেওয়ায়েত নম্বর: ৪০৯। শুআবুল ইমান, বায়হাকি, রেওয়ায়েত নম্বর: ১৬৬। দালাইলুল নবুওয়াত, বায়হাকি ২/৪১৩।

[2]. মুসনাদে আহমদ, রেওয়ায়েত নম্বর: ১৫১৯২।

[3]. নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিজেকে বিভিন্ন গোত্রের সামনে পেশ করার বিষয়ে সিরাতের কিতাবসমূহে যে উপাদান পাওয়া যায়, তা হলো:

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مِنَ الطَّائِفِ إِلَىٰ) مَكَّةَ، وَقَوْمُهُ أَشَدُّ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ خِلَافِهِ وَفِرَاقِ دِينِهِ، إِلَّا قَلِيلًا مُسْتَضْعَفِينَ، مِمَّنْ آمن بِهِ. فَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ فِي الْمَوَاسِمِ، إِذَا كَانَتْ، عَلَى قَبَائِلِ الْعَرَبِ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللّٰهِ، وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّهُ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، وَيَسْأَلُهُمْ أَنْ يُصَدِّقُوهُ وَيَمْنَعُوهُ حَتَّى يُبَيِّنَ (لَهُمْ) اللّٰهُ مَا بَعَثَهُ بِهِ.

“ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন: তারপর আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (তায়েফ থেকে) মক্কায় ফিরে এলেন, সেই সময় নবীজির সম্প্রদায় তার বিরোধিতা এবং তার নিয়ে আসা ধর্মের সাথে দ্বিমত পোষণে পূর্বের তুলনায় অধিক কঠোর হয়, কেবল অল্প কিছু দুর্বল মানুষ ছাড়া, যারা তার ওপর ইমান এনেছিল। সুতরাং যখনই হজ্জের সময় আসত, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের দাওয়াত আরব গোত্রগুলোর সামনে পেশ করতেন।তিনি তাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকতেন এবং জানাতেন যে, তিনি আল্লাহর পাঠানো নবী। তিনি তাদেরকে বলতেন যেন তারা তার সত্যতা স্বীকার করে এবং তার হেফাজত করে, যতক্ষণ না আল্লাহ মানুষের সামনে সেই ধর্মকে প্রকাশ করেন, যার সাথে তিনি তাকে পাঠিয়েছেন।”

[৪]. মুসনাদে আহমদ, রেওয়ায়েত নম্বর: ১৫১৯২।

[৫]. শারহু উসুলিল ইতিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআত, রেওয়ায়েত নম্বর: ১৪২১।

নারীর সত্তা

ড. ফারুক খান

ইসলাম মনে করে, একজন নারী পুরুষের অনুগত কোনো সত্তা নয়, বরং সব দিক থেকে তার নিজস্ব স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ সত্তা রয়েছে। নিজের ধর্মীয় যোগ্যতাকে বিকশিত করা, ধর্মের সেবা করা, শিক্ষা অর্জন করা, চাকরি করা, ব্যবসা করা, কোনো কিছুর মালিক হওয়া এবং তা থেকে উপকৃত হওয়া ও কোনো উদ্যোগে নিজের সৃজনশীলতা প্রমাণ করার অধিকার পুরুষের মতো তার-ও রয়েছে। সে সব দিক থেকে নিজের ব্যক্তিত্বের মালিক। এই সত্যের ধর্মীয় দিকটি কুরআন মাজিদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

“মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী; ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনয়ী পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী; রোজা পালনকারী পুরুষ ও নারী; নিজেদের সতীত্বের হেফাযতকারী পুরুষ ও নারী এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী – তাদের সবার জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহান প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।”

(কুরআন, সুরা আহজাব, ৩৩: ৫৫)

কুরআন মাজিদের উপরিউক্ত আয়াতে যে বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা বলা হয়েছে, তার সংখ্যা দশ।এই বৈশিষ্ট্যগুলো ইসলাম, ইসলামি আচরণ এবং আল্লাহর হক ও মানুষের হকের সাথে সম্পর্কিত আচার-ব্যবহারের সব দিককে শামিল করে। উপরিউক্ত আয়াতটি স্পষ্ট করে যে, আল্লাহর ইবাদত, আনুগত্য এবং পরকালীন জীবনের মর্যাদার ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। মূলত লিঙ্গের ভিত্তিতে কোনো পার্থক্য নেই। কুরআন মাজিদ সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নীতি নির্ধারণ করেছে:

“পুরুষরা যা উপার্জন করে, তার অংশ তাদের এবং নারীরা যা উপার্জন করে, তার অংশ তাদের।”

(কুরআন, সুরা নিসা, ৪: ৩২)

সুরা আন-নিসা মূলত অর্থ-সম্পদ সংক্রান্ত বিষয় এবং পরিবারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর সম্পর্কের ফলে উদ্ভূত সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করে; উপরিউক্ত আয়াতের ঠিক পরেই উত্তরাধিকার আইনের একটি ধারা বর্ণিত হয়েছে এবং এরপর স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কের নির্দেশনা এসেছে। সুতরাং প্রেক্ষাপট এটা স্পষ্ট করে যে, উক্ত আয়াতটি পার্থিব জীবনের সাথে সম্পর্কিত এবং একজন নারীর শিক্ষা গ্রহণ, চাকরি বা ব্যবসা করা, সম্পত্তি কেনাবেচা করা এবং এমনকি নিজের ব্যক্তিত্ব গড়ার অধিকার পুরুষের মতোই রয়েছে।

আরও অনেক কুরআনিক আয়াত রয়েছে, যা স্পষ্ট করে: [‘পরিবার’ নামক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পরিবারের] দায়িত্ব বহনের ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোনো কারণে পুরুষ ও নারীর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়ই মানুষ এবং উভয়েরই অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। আল্লাহ বলেন:

“আমি তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষ বা নারীর কর্মের প্রতিদান নষ্ট করব না। তোমরা একে অপরের বংশধর।”

(কুরআন, সুরা আলে-ইমরান, ৩: ১৯৫)

সুরা তওবার মাধ্যমে আল্লাহতায়ালা সমস্ত মুসলিম পুরুষ ও নারীকে একে অপরের বন্ধু, সঙ্গী ও সাহায্যকারী হিসেবে ঘোষণা করেছেন। সুতরাং নারীরা কোনোভাবেই পুরুষের চেয়ে নিম্নতর নয়, বরং তারা পুরুষের বন্ধু এবং তাদের সমকক্ষ।(তবে, দায়িত্বের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিস্থিতিতে শ্রেণিবিভাগ থাকতে পারে, যেমন একজন ডাক্তার এবং একজন শিক্ষক):

“মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু।তারা ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে; তারা তাদের নামাজ আদায় করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের আনুগত্য করে। তাদের ওপর আল্লাহ অবশ্যই রহমত বর্ষণ করবেন।তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।”

(কুরআন, সুরা তওবা, ৯: ৭১)

এ কারণেই নবুয়তের যুগে নারীরা ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় শিক্ষা অর্জন করতেন, কৃষিকাজ করতেন, ব্যবসা ও শিল্পে অংশগ্রহণ করতেন এবং নিজেদের ধন-সম্পদ ও সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা করতেন; নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রী আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিষয়ে সবাই জানেন যে, তিনি ২২১০টি হাদিস বর্ণনা করেছেন। (সাদারাতুজ জাহাব: খণ্ড ১)

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম এমন পুরুষ ও নারী ফকিহ তথা আইনজ্ঞদের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন, যারা আইনের বিষয়ে মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং এই প্রেক্ষিতে ফয়সালাও দিয়েছেন।আমরা যদি সেই তালিকার দিকে তাকাই তবে অবাক হয়ে দেখব যে, তাদের মধ্যে বিশাল সংখ্যক নারী ছিলেন।এদের মধ্যে রয়েছেন আয়েশা, উম্মে সালমা, হাফসা, সাফিয়া, উম্মে হাবিবা, লায়লা বিনতে কাসিম, আসমা বিনতে আবু বকর, উম্মে শারিক, খাওলা বিনতে উম্মে দারদা, আতিকা বিনতে যায়েদ, সাহলা বিনতে সুহাইল, জুয়াইরিয়া, মাইমুনা, ফাতিমা বিনতে কাইস, উম্মে আইমান, উম্মে ইউসুফ, আসরা ইত্যাদি। (ইলামুল মুয়াক্কিন, খণ্ড ১)

আল্লাহর রাসুলের সঙ্গীদের যুগের ইতিহাস সংকলনের বইগুলো এমন অসংখ্য নারীর গল্প প্রকাশ করে, যারা ধর্মীয় জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন এবং অনেক বিশিষ্ট আলেম তাদের কাছ থেকে ইসলামের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।সেই যুগে এটা একটি সাধারণ রীতি ছিল যে, মানুষ ধর্মের বিষয়ে আল্লাহর রাসুলের স্ত্রীদের থেকে নির্দেশনা চাইতেন। আল্লাহর রাসুলের স্ত্রীদের ছাড়াও এমন কিছু নারী ছিলেন, যারা এই ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। রাবি বিনতে মুয়াওভিয ছিলেন এমন একজন বিখ্যাত আলেমা এবং ইসলামের বিশিষ্ট আলেম, যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর তার ছাত্র ছিলেন। অনেক লোক তার রেফারেন্সে হাদিস বর্ণনা করেছেন। এদের মধ্যে সালমান ইবনে ইয়াসার, ইবাদ ইবনে ওয়ালিদ এবং নাফি বিন ওমর ইত্যাদি রয়েছেন।ইবনে মুসাইয়্যিব, উরওয়া ইবনে যুবায়ের এবং শাবির মতো বিশিষ্ট আলেমদের শিক্ষিকা ছিলেন ফাতিমা বিনতে কাইস। (আল-ইসতিআব ফিল আসমাউল আসহাব)

সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কন্যা আয়েশা একজন বিশিষ্ট আলেমা ছিলেন এবং তিনি ইমাম মালেক, আইয়ুব সাখতিয়ানি ও হাকাম বিন উতাইবার মতো আলেমদের শিক্ষা দিয়েছেন।(তাহজিবুত তাহজিব, খণ্ড ১২) বিশিষ্ট ফকিহ ইমাম শাফেয়ি (রহ.) আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রপৌত্র হযরত হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নাতনী সাইয়্যিদা নাফিসা (রহ.)-এর থেকে হাদিসের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। (ওয়াফিয়াতুল আয়ান লিইবনি খাল্লিকান, খণ্ড ২)

পার্থিব জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা ছিল। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নারী সাহাবিদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন কবি, যেমন খানসা, সাওদা, সাফিয়া, আতিকা, মারিদিয়া, উম্মে আইমান এবং আরও অনেকে। চিকিৎসা ও শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে রুফাইদা আসলামিয়াহ, উম্মে মুতা, উম্মে কাবশা, হামনা বিনতে জাহাশ, উম্মে আতিয়্যাহ, উম্মে সুলাইম এবং আরও অনেক নারী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। (তাবাকাত ইবনে সাদ, ইসাবা ফি তাময়িযিস সাহাবা)

সেই দিনগুলোতে নারীদের পার্থিব জ্ঞান অর্জন করা ছিল একটি সাধারণ রীতি। যদি তাদের সংখ্যা খুব বেশি দৃষ্টিগোচর না হয়, তবে এর কারণ ছিল সুযোগ-সুবিধার অভাব। কিছু সাধারণ নারীও পড়তে ও লিখতে জানতেন এবং ছোটখাটো হিসাব-নিকাশ পরিচালনা করতে পারতেন। (তাবাকাত ইবনে সাদ, খণ্ড ৮) কিছু নারী লিখতেনও এবং চিঠির উত্তরও পাঠাতেন। (আল-আদাবুল মুফরাদ)

সেই সময়ে নারীরা কৃষিকাজ করতেন এবং নিজেদের ক্ষেত খামারের দেখাশোনা করতেন।হাদিস সংকলক বুখারিতে সাহল বিন সাদ একজন সাহাবি নারীর গল্প বর্ণনা করেছেন, যার নিজস্ব ক্ষেত ও বাগান ছিল। তিনি একটি খালের তীরে 'সিলক' (এক ধরনের সবজি) চাষ করতেন এবং প্রতি জুমুআ-তে সাহল বিন সাদ ও অন্যদের সাথে যখন দেখা করতে যেতেন, তখন তিনি তাদের সিলক ও যব দিয়ে আপ্যায়ন করতেন।(বুখারি)

বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ-এর মতো সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হাদিস গ্রন্থগুলোতে জাবির বিন আব্দুল্লাহর বিবৃতি উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে তিনি তার খালা সম্পর্কে বর্ণনা করেন। তিনি তালাকপ্রাপ্তা ছিলেন এবং ইদ্দত [তালাকের পর তিন মাসের অপেক্ষা, যে সময়ে নারী পুনরায় বিবাহ করতে পারেন না] পালন করছিলেন। তিনি তার জীবিকার জন্য বাগানের ফল বিক্রি করতে চেয়েছিলেন। তিনি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে পরামর্শ চাইলে তিনি তাকে তা করার পরামর্শ দেন, কারণ এতে তিনি সাদাকা দেওয়ার সুযোগ পেতেন এবং নিজের পরিত্রাণের জন্য কিছু করতে পারতেন। এটা পরিষ্কার করে যে, নবুয়তের যুগে নারীরা কৃষিকাজ ও ব্যবসা করতেন।

বুখারির মতে, প্রথম খলিফা আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কন্যা এবং যুবাইর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর স্ত্রী আসমা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তার বাড়ি থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে ক্ষেতে কৃষিকাজে স্বামীকে সাহায্য করতেন।

সেই দিনগুলোতে নারীরা স্বাধীনভাবে বাণিজ্য ও ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পারতেন। মুসলিম উম্মতের সবচেয়ে সম্মানিত নারী খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনেক নারী সাহাবি, যেমন খাওলা, আল-খামিয়াহ, সাকাফিয়াহ এবং বিনতে মুকাররামাহ সুগন্ধির ব্যবসা করতেন। (ইসাবা ফি তাময়িযিস সাহাবা, খণ্ড ৪)

'তাবাকাত ইবনে সাদ'-এ বর্ণিত বেশ কিছু ঘটনা এই সত্য প্রকাশ করে যে, নবুয়তের যুগে মুসলিম নারীরা স্বামীদের সহায়তা ছাড়াও কৃষিকাজ, ব্যবসা ও শিল্পকর্মে অংশগ্রহণ করতেন। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর স্ত্রী একজন দক্ষ কারিগর ছিলেন। একবার তিনি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলেছিলেন যে, তিনি বিভিন্ন শিল্পকর্মে দক্ষ এবং তৈরি পণ্য বিক্রি করেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন যে, আয়ের টাকা স্বামী ও সন্তানদের ওপর খরচ করা যাবে কি না, যাদের আয়ের অন্য কোনো উৎস নেই। আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেছিলেন, তিনি যদি তা করেন, তবে আল্লাহর থেকে পুরস্কার পাবেন। এটা আল-ইসাবা ফি তাময়িযিস সাহাবা খণ্ড ৪-এ উদ্ধৃত হয়েছে।

একবার খাওলা বিনতে সালাবা নামক এক নারীর তার স্বামীর সাথে ঝগড়া হয়েছিল। দুজনেই আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে তাদের সমস্যা উপস্থাপন করলে তিনি স্বামীকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ না আসা পর্যন্ত স্ত্রীর থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেন। তখন খাওলা আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললেন যে, স্বামী সেক্ষেত্রে টিকে থাকতে পারবে না, কারণ সে তার জীবিকার জন্য তার ওপর নির্ভরশীল।

কায়লা নামক এক নারী আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলেছিলেন যে, তিনি একজন ব্যবসায়ী এবং বাণিজ্যের বিষয়ে তার দিকনির্দেশনা চেয়েছিলেন।

আরেক নারী আমিরা বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি তার দাসীকে নিয়ে বাজারে গিয়েছিলেন এবং একটি মাছ কিনেছিলেন। চতুর্থ খলিফা আলি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি তার কাছ থেকে সেই মাছটি কিনেছিলেন।

এমন আরও অনেক ঘটনা 'তাবাকাত ইবনে সাদ' খণ্ড ৮-এ রয়েছে, যা এই বিষয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বই।

নবীর স্ত্রী সাওদা চর্মশিল্পের কাজে দক্ষ ছিলেন। বুখারিতে বর্ণিত আছে যে, একবার তার একটি ভেড়া মারা যায়, তিনি সেটার চামড়া ছাড়িয়ে তা ট্যানিং করেন এবং খেজুরের মাধ্যমে সেটাকে নরম করেন। (বুখারি)

সেই সময়ে নারীরা সামষ্টিকভাবেও বিভিন্ন কাজ আঞ্জাম দিতেন। বুখারির কিতাবুল ইতিসাম-এ বর্ণিত হয়েছে যে, একবার অনেক নারী আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে দেখা করতে যান এবং সপ্তাহে একদিন তাদের ধর্মীয় প্রশিক্ষণের জন্য সময় বরাদ্দ করার অনুরোধ করেন।নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের অনুরোধ মঞ্জুর করেন।আসমা বিনতে যায়েদ বাগ্মিতায় দক্ষ ছিলেন।একবার নারীরা তাকে তাদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে পাঠান কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য। (আল-ইসতিআব ফিল আসমাউল আসহাব)

নারীদের কিছু দায়িত্বশীল পদেও নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং তারা তাদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছিলেন।উদাহরণস্বরূপ, ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) শিফা বিনতে আব্দুল্লাহকে বাজার তদারকির কর্মকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন।

ধর্মীয় অনুশাসন, নৈতিক আচরণ এবং মানবিক অধিকারের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ যে একে অপরের পরিপূরক ও সমান – এই সত্যটি আমাদের সামনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসার জন্ম দেয়।

যেমন: আদম (আলাইহিস সালাম)-এর পাঁজরের হাড় থেকে প্রথম নারী হাওয়া (আলাইহাস সালাম)-কে সৃষ্টির তাৎপর্য কী? পরিবার ও সমাজে পুরুষের কর্তৃত্ব বা নেতৃত্ব বলতে কী বোঝায়? কিংবা ইসলামি আইনশাস্ত্র অনুযায়ী নারীর রক্তের বিনিময় বা আদালতের সাক্ষ্যের বিষয়টি কীভাবে নির্ধারিত হয়?

প্রবন্ধের কলেবর ও প্রসঙ্গের সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনায় রেখে, এখানে আমি কেবল প্রথম প্রশ্নটি অর্থাৎ সৃষ্টির উৎস সংক্রান্ত প্রচলিত ধারণার ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করব। বাকি বিষয়গুলো প্রাসঙ্গিক অন্য কোনো আলোচনায় স্থান পাওয়ার দাবি রাখে।

কুরআন বলছে:

“হে মানুষ, তোমাদের রবের ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক সত্তা থেকে এবং সেই একই সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়াকে এবং এই উভয় থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী।”

(কুরআন, সুরা নিসা, ৪: ১)

“সেই একই সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়াকে” – এই বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় দুটি সম্ভাবনা থাকতে পারে। প্রথমটি হলো, এই জোড়াকে সেই একই সত্তা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়টি হলো, এই জোড়াকে তার প্রজাতি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রথম সম্ভাবনাটি নিলে দাঁড়ায় যে, আদম (আলাইহিস সালাম)-কে আগে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং হাওয়া (আলাইহিস সালাম)-কে তার মধ্য থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি দেখায় যে, মানুষের একটি প্রতিচ্ছবি আগে তৈরি করা হয়েছে এবং সেই প্রতিচ্ছবি থেকেই আদম ও হাওয়াকে আলাদাভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে।

কুরআন সঠিকভাবে বোঝার জন্য একটি প্রতিষ্ঠিত নিয়ম রয়েছে: যদি কুরআনের কোনো আয়াত এক জায়গায় নিজের অর্থ স্পষ্ট না করে, তবে একই বিষয়ের ওপর অন্য সব আয়াত নিয়ে অধ্যয়ন করতে হবে, যাতে সঠিক বোধগম্যতা আসে। উদাহরণস্বরূপ, সুরা আন-নাহলের নিম্নলিখিত আয়াতটি দেখুন:

“আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের মাধ্যমেই তিনি তোমাদেরকে সন্তান ও পৌত্র দান করেছেন।তিনি তোমাদেরকে পবিত্র বস্তু থেকে রিজিক দিয়েছেন।”

(কুরআন, সুরা নাহল, ১৬: ৭২)

এই আয়াতটি এই অর্থ প্রকাশ করে যে, স্ত্রীদের সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের প্রজাতি থেকে, তাদের স্বামীদের পাঁজরের হাড় থেকে নয়। সুরা রুমের আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে:

“এবং তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পারো। এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।”

(কুরআন, সুরা রুম, ৩০: ২১)

যখন আমরা সুরা নিসার ১ নম্বর আয়াতের অর্থ ওপরের উদ্ধৃত আয়াতগুলোর আলোকে বোঝার চেষ্টা করি, তখন বিষয়টি একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায়। কারণ কুরআনের কোনো অংশই অন্য অংশের পরিপন্থী নয়, বরং পুরো কিতাবটি একই অর্থ প্রদান করে।

এখন আমরা রেফারেন্স বা তথ্যসূত্রের বইগুলোর দিকে ফিরে তাকাই।হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সূত্রে একটি হাদিস রয়েছে এবং তা বুখারি কিতাবুন নিকাহ, কিতাবুল আহাদিসুল আম্বিয়া এবং মুসলিম কিতাবুর রিদা-তে রাখা হয়েছে।রেফারেন্সের শব্দগুলো সব জায়গায় ভিন্ন, যেমনটা খুবই স্বাভাবিক ছিল যে, একজন ব্যক্তি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছ থেকে কিছু শুনেছেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের একজন ব্যক্তিকে তা বলেছেন এবং এভাবে চলতে থেকেছে।এভাবে এই হাদিসটি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইন্তেকালের দুইশ বছর পর হাদিসের সংকলকের কাছে পৌঁছেছে।

এটা স্পষ্ট যে, এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় বাণীর শব্দগুলো একই থাকে না।এই সবকিছুর পিছনে মূল উদ্দেশ্য হলো শ্রোতার বোঝা অর্থটি পৌঁছে দেওয়া।তাই এটা গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য যে, প্রতিটি হাদিসকে কুরআনের আলোকে বুঝতে হবে, যা ইসলামের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং মৌলিক দলিল।হাদিস অধ্যয়নের সময়, প্রাসঙ্গিক সব হাদিস মনে রাখতে হবে এবং কোনো সন্দেহের অবসানের জন্য কোনো হাদিস থেকে আলাদা বা বিচ্ছিন্ন অর্থ গ্রহণ করা উচিত নয়।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর ওপরের আলোচিত হাদিসটি নিয়ে চিন্তা করা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়।এই হাদিসটির একমাত্র বর্ণনাকারী হলেন আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)।দেখে মনে হয় যেন আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানুষদের উপদেশ দিচ্ছিলেন যেন তারা তাদের স্ত্রীদের সাথে ভালো আচরণ করে এবং তাদের সাথে মানিয়ে চলে।তাদের কোনো কঠোর নিয়ম-কানুনের ছাঁচে ঢালার চেষ্টা করা উচিত নয় এবং তাদের সাথে প্রজ্ঞার সাথে কাজ করা উচিত।যদি তাদের স্ত্রীরা অভিযোগ করতে, সন্দেহ করতে এবং তাদের জন্য সমস্যা তৈরি করতে শুরু করে, তবুও তাদের ভালোবাসা ও নম্রতার সাথে বোঝানোর চেষ্টা করা উচিত।তাই আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নারীর মনস্তত্ত্বকে পাঁজরের হাড়ের সাথে তুলনা করেছেন।যদি এটাকে সোজা করার চেষ্টা করা হয়, তবে তা ভেঙে যেতে পারে।সুতরাং, যদি কোনো নারীকে কঠোর কোনো নিয়ম বা কোডের অধীনে রাখার জন্য চাপ দেওয়া হয়, তবে এর ফলে তালাক ঘটতে পারে।

স্পষ্টতই, মানুষদের বোঝানোর জন্য এটা একটি চমৎকার উদাহরণ।কুরআন ও হাদিস এমন উদাহরণে পরিপূর্ণ এবং সেগুলো সবসময় তাদের বাগধারাগত অর্থ প্রদান করে।তাই বিভিন্ন বর্ণনাকারী একই বক্তব্যকে ভিন্ন ভিন্ন শব্দে প্রকাশ করেছেন: “নারী পাঁজরের হাড়ের মতো।”

মুসলিমের কিতাবুর রিদা-তে রেকর্ড করা এই রেফারেন্সটি মনে হচ্ছে মূল শব্দগুলোকেই প্রতিফলিত করছে। বাকি বর্ণনাকারীরা তাদের বোধ ও রুচি অনুযায়ী তা বর্ণনা করেছেন। যদি আমরা পুরো বিষয়টি নিয়ে অধ্যয়ন করি, তবে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এটা নিছক একটি উদাহরণ, কারণ কোনো রেফারেন্সেই হাওয়া বা নারী সম্প্রদায়কে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি হওয়ার কথা বলা হয়নি।প্রত্যেকেই এই সত্য জানে যে, নারীরা পুরুষের পাঁজরের হাড় থেকে জন্ম নেয় না, বরং তারা পুরুষের মতোই জন্মের সব ধাপ পার হয়ে আসে।

সুতরাং, ওপরের আলোচনা প্রমাণ করে যে, ইসলামে এমন কোনো ধারণা নেই যে নারী পুরুষের চেয়ে নিম্নতর এবং যেহেতু সে পুরুষের পাঁজর থেকে সৃষ্টি, তাই সে তার অনুগত বা অধীনস্থ।

[ড. মুহাম্মদ ফারুক খান (১৯৫১-২০১০): বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ এবং সোয়াত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য।লেখক হিসেবে তিনি 'জিহাদ, কিতাল ও ইসলামি বিশ্ব', 'ইসলাম ও নারী' এবং 'আধুনিক মনের প্রশ্ন ও ইসলামের উত্তর'-সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের রচয়িতা।

আল-মাওরিদের সাথে যুক্ত এই নির্ভীক লেখক ও গবেষক তার সংস্কারপন্থী চিন্তাধারার জন্য সন্ত্রাসীদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন এবং ২০১০ সালে আততায়ীর গুলিতে শাহাদাতবরণ করেন। তার এই অসামান্য সাহসিকতা ও অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পাকিস্তান সরকার তাকে মরণোত্তর 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ' সম্মানে ভূষিত করে]

নারীদের ব্যাপারে প্রচলিত ভুলধারণা

ড. শেহজাদ সেলিম

নারীরা পুরুষের তুলনায় কম বোধশক্তি-সম্পন্ন

সাধারণত নিচের রেওয়ায়েতটিকে এই মতের সমর্থনে উপস্থাপন করা হয় যে, নারীরা পুরুষের তুলনায় কম বোধশক্তি-সম্পন্ন:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ ...مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا.

আবু সাইদ আল-খুদরি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন: একবার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আজহার দিনে ঈদগাহে যাচ্ছিলেন। তিনি নারীদের একটি দলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন: ... তোমাদের চেয়ে অন্য কাউকে দেখিনি, যারা একজন দৃঢ়চেতা পুরুষের জ্ঞানবুদ্ধি হরণ করতে পারে, অথচ তোমরা ‘নাকিসাতু আকলিন ওয়া দ্বিন’ (কম বুদ্ধি ও কম ধর্মসম্পন্ন)।

নারীরা বলল: হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের এই ধর্ম ও বুদ্ধির ঘাটতি জিনিসটা কী? তিনি বললেন: একজন নারীর সাক্ষ্য কি একজন পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? তারা বলল: হ্যাঁ। তিনি বললেন: এটা তাদের জাগতিক বিষয়ে ঘাটতি। তিনি আবার বললেন: এটা কি সত্য নয় যে, যখন তারা ঋতুস্রাবের সময়ে থাকে, তখন তারা নামাজ পড়ে না এবং রোজাও রাখে না? তারা বলল: হ্যাঁ। তিনি বললেন: এটা তাদের ধর্মীয় বিষয়ে ঘাটতি।

এই ভুল ধারণাটি আরবি শব্দগুচ্ছ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ (নাকিসাতু আকলিন ওয়া দ্বিন)-এর ভুল অনুবাদের কারণে তৈরি হয়েছে। উর্দু অর্থের দিকে খেয়াল রেখে 'নাকাস'-এর অনুবাদ সাধারণত 'ত্রুটিপূর্ণ' করা হয়েছে। অথচ আরবিতে 'নাকাসা' ক্রিয়াটির অর্থ হলো 'কমানো বা লাঘব করা'। আর এখানে 'আকল' বলতে 'জাগতিক বিষয়' বোঝানো হয়েছে, যেহেতু এটা 'দ্বিন' তথা ধর্ম শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। এই দুটি দিক বিবেচনায় নিলে, প্রসঙ্গ অনুযায়ী সঠিক অনুবাদ হলো, নারীদের জাগতিক ও ধর্মীয় বিষয়ে একটি অবকাশ বা ছাড় দেওয়া হয়েছে।

এই রেওয়ায়েতে উল্লিখিত জাগতিক দায়িত্বের ক্ষেত্রে ছাড় হলো, নারীদের নির্দিষ্ট কিছু কাজে ও ময়দানে টেনে আনা হয়নি। যেমন, কুরআন পুরুষদের আইনি নথিপত্রে সাক্ষ্য দেওয়ার তাগিদ দিয়েছে, যাতে নারীদের আদালতে উপস্থিত হওয়া এবং তাদের মূল্যবান সময় এমন বিষয়ে নষ্ট করা থেকে মুক্তি দেওয়া যায়, যা অন্যরা সামলাতে পারে। যদি পুরুষরা উপলব্ধ না থাকে, কেবল তখনই কোনো সমাজ নারীদের এমন বিষয়ে সম্পৃক্ত করতে পারে।

ধর্মীয় বিষয়ে নারীদের যে ছাড় দেওয়া হয়েছে তা হলো, এই রেওয়ায়েত অনুযায়ী মাসিক ঋতুস্রাবের সময়ে তাদের নামাজ ও রোজা পালন করতে হয় না।

সুতরাং যে বিষয়টি মনে রাখতে হবে, তা হলো, দুটি ভিন্ন ভাষায় একটি শব্দের অর্থ সবসময় একই থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, আরবিতে 'গালিয' শব্দের অর্থ হলো 'দৃঢ়', অথচ উর্দুতে এর অর্থ হলো 'নোংরা'। এ কারণেই কুরআন (৪:২১)-এ বিবাহকে 'মিসাকান গালিযা' (দৃঢ় অঙ্গীকার) বলা হয়েছে।

অধিকন্তু, যারা এই রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে মনে করে, নারীরা পুরুষের চেয়ে কম বোধশক্তি সম্পন্ন, তারা বোঝে না যে, রেওয়ায়েতটিতে কেবল এটাই বলা হচ্ছে না যে, নারীরা 'নাকিসাতু আকল' (বুদ্ধি কম), বরং এটাও বলা হচ্ছে, তারা 'নাকিসাতু দ্বিন'। যদি 'নাকিসাতু আকল'-এর অর্থ হয়: তাদের আকল বা বুদ্ধিতে কোনো ত্রুটি আছে, তবে একই যুক্তিতে 'নাকিসাতু দ্বিন'-এর অর্থ হওয়া উচিত: তাদের পালন করা ধর্মেও কোনো ঘাটতি আছে! এটা অবশ্যই অযৌক্তিক এবং যেমনটি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, মূলত এটা উর্দু অর্থকে বিবেচনায় রাখার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে।

নারীর জন্য মাহরামসহ সফর করা

অধিকাংশ আলেমদের মতে, নারীদের জন্য মাহরাম (এমন আত্মীয়, যাদের সাথে বিবাহ হারাম) ছাড়া একা ভ্রমণ করা নিষেধ। এমনকি হজ্জের মতো গুরুত্বপূর্ণ সফরের ক্ষেত্রেও তারা মাহরামের উপস্থিতি অপরিহার্য মনে করেন। এই মতামতের সপক্ষে তারা নিচে উল্লিখিত হাদিসগুলোকে দলিল হিসেবে পেশ করেন:

لَا يُحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِيمَحْرَمٍ عَلَيْهَا

আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: 'আল্লাহ ও পরকালের ওপর বিশ্বাসী কোনো নারীর জন্য মাহরাম ছাড়া একদিন ও এক রাতের দূরত্বে সফর করা বৈধ নয়।

نُهِيَأَنْ تُسَافِرَالمَرْأَةَمَسِيْرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجَهَا أَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ

আবু সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: 'নারীকে দুই দিনের দূরত্বে সফর করতে নিষেধ করা হয়েছে, যদি না তার সাথে তার স্বামী অথবা কোনো মাহরাম থাকে।

আমাদের এটা বুঝতে হবে যে, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনেক সময় মুসলমানদের কল্যাণের কথা চিন্তা করে বিশেষ কিছু নির্দেশনা দিয়েছিলেন। তবে পরিস্থিতি বদলে গেলে এমন অনেক নির্দেশনা সময়ের প্রয়োজনে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। নারীদের ভ্রমণের এই নির্দেশনাটিও ঠিক এমনই একটি বিষয়।

তৎকালীন আরব সমাজে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং তাদের সম্মান রক্ষা করা ছিল অনেক বড় চ্যালেঞ্জ।সে সময়ের অস্থিতিশীল ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে নারীরা যেন নিরাপদে ভ্রমণ করতে পারেন, সেজন্যই রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের মাহরাম সাথে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আজকেও যদি কোথাও ভ্রমণের ক্ষেত্রে সেই একই ঝুঁকি বা নিরাপত্তাহীনতা থাকে, তবে অবশ্যই সেই শর্ত মেনে চলা উচিত।

কিন্তু বর্তমান যুগে যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এখনকার অনেক ভ্রমণ পথ ও মাধ্যম আগের তুলনায় অনেক বেশি নিরাপদ। তাই আধুনিক ও নিরাপদ যাতায়াতের ক্ষেত্রে মাহরামের সেই শর্তটি আর বাধ্যতামূলক থাকে না। ভ্রমণটি কতটা নিরাপদ, তা যাচাই করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়টি এখন সংশ্লিষ্ট নারীর নিজের বিবেচনার ওপর ছেড়ে দেওয়া যায়।

পুরুষ নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ

অনেকে মনে করেন, কুরআন অনুযায়ী পুরুষ নারীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।তারা তাদের এই ধারণার পক্ষে সাধারণত নিচের আয়াতগুলো তুলে ধরে:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.

“পুরুষরা নারীদের অভিভাবক, কারণ আল্লাহ তাদের একজনকে অন্যজনের ওপর বিশেষ ক্ষমতা বা দায়িত্ব দিয়েছেন এবং কারণ পুরুষরা তাদের সম্পদ থেকে ব্যয়ভার বহন করে।”

(কুরআন, সুরা নিসা, ৪: ৩৪)

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“আর স্ত্রীদের ওপর তাদের (তথা স্বামীদের) এক ধাপ মর্যাদা রয়েছে।”

(কুরআন, সুরা বাকারা, ২: ২২৮)

আমাদের এটা বুঝতে হবে যে, কুরআন (যেমন: ৩:১৯৫ ও ৪:১) অনুযায়ী মানুষ হিসেবে নারী ও পুরুষ সমান মর্যাদার অধিকারী। তবে পরিবার পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাদের ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব দিয়েছেন, যার কারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে একে অপরের ওপর এক ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব বা বিশেষত্ব তৈরি হয়েছে।

কুরআনের ৪:৩৪ আয়াতে স্বামীর যে ‘শ্রেষ্ঠত্বের’ কথা বলা হয়েছে, তা মূলত পরিবারের প্রধান বা অভিভাবক হিসেবে তার নির্দিষ্ট দায়িত্বের দিকে ইঙ্গিত করে। সুরা বাকারার ২২৮ নম্বর আয়াতে ‘স্ত্রীদের ওপর স্বামীদের এক ধাপ শ্রেষ্ঠত্ব’ বলতেও মূলত এই দায়িত্বের ধাপ-কেই বোঝানো হয়েছে।আবার কিছু কিছু ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে নারীরা তাদের শারীরিক, জৈবিক ও মানসিক গঠনের কারণে পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি দক্ষ ও শ্রেষ্ঠ।

সুতরাং, ৪:৩৪ আয়াতে বলা শ্রেষ্ঠত্বটি কেবল পরিবার প্রধানের দায়িত্ব ও অধিকারের সাথে সম্পর্কিত একটি বিশেষ ক্ষেত্র, এটাকে নারী-পুরুষের সামগ্রিক শ্রেষ্ঠত্বের কোনো সাধারণ নিয়ম হিসেবে দেখার সুযোগ নেই।

কুরআনের ৪:৩৪ আয়াতে স্বামীদের এই অভিভাবকত্বের মর্যাদার পিছনে মূলত দুটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে:

প্রথমত, সাধারণত শারীরিক ও স্বভাবগত সামর্থ্যের কারণে তারা এই দায়িত্ব পালনে বেশি উপযুক্ত; এবং দ্বিতীয়ত, পরিবারের ভরণপোষণের মূল দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করা হয়েছে।

এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া জরুরি – ইসলাম নারীদের উপার্জন করতে নিষেধ করেনি। ইসলাম কেবল তাদের উপার্জনের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত রেখেছে, যা মূলত স্বামীদের দায়িত্ব। আবার, স্ত্রী উপার্জন করুক বা না করুক, পরিবারের যাবতীয় খরচ বহনের দায়িত্ব স্বামীর ওপরই বর্তায়। অর্থাৎ পরিবারের প্রধান হিসেবে স্বামীর মর্যাদাটি তার উপার্জনের দায়িত্বের সাথে সরাসরি যুক্ত। কোনো নারী চাইলে উপার্জন করতে পারেন, তবে যেহেতু পারিবারিক ব্যয়ভার তার ওপর ন্যস্ত নয়, তাই পরিবার প্রধানের বিশেষ অধিকারটিও তাকে দেওয়া হয়নি।

অনেকে মনে করেন, পুরুষ নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ – এই ভুল ধারণার পিছনে একটি হাদিসও কাজ করে। অনেকে মনে করেন, নারীকে পুরুষের পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করার অর্থ হলো, হাওয়া (আলাইহাস সালাম) আদমের (আলাইহিস সালাম)-এর পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি হয়েছেন বলে তিনি পুরুষের তুলনায় গৌণ বা দুর্বল সত্তা।হাদিসটির মূল অংশটি হলো:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فإن الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ من ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ في الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لم يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ.

আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: নারীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো। কারণ নারীকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পাঁজরের সবচেয়ে বাঁকা অংশ হলো এর ওপরের দিকের হাড়। যদি তুমি তা জোর করে সোজা করতে যাও, তবে তা ভেঙে যাবে; আর যদি তুমি সেটাকে সেভাবেই রেখে দাও, তবে তা বাঁকাই থেকে যাবে। তাই নারীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো।

এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া জরুরি – কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী কিন্তু হাওয়াকে আদমের পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়নি। সুরা নিসার প্রথম আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহতায়ালা প্রথম পুরুষ ও নারীকে (আদম ও হাওয়া) সরাসরি সৃষ্টি করেছেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

“হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের ভয় করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক সত্তা থেকে এবং সেই সত্তা থেকেই সৃষ্টি করেছেন তার জোড়াকে। আর এই উভয়ের মাধ্যমে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন অসংখ্য পুরুষ ও নারী। আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে চেয়ে থাকো এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের ব্যাপারে সতর্ক থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষক।”

(কুরআন, সুরা নিসা, ৪: ১)

অনেকে এই আয়াতের অনুবাদ এভাবে করেন যে, ‘তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক সত্তা (আদম) থেকে এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রী (হাওয়া)-কে। এরপর তারা দাবি করেন যে, হাওয়াকে আদমের পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মূলত এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে আরবি শব্দ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا (এবং সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তার জোড়াকে)-এর আক্ষরিক অর্থ করার কারণে।

প্রকৃতপক্ষে, এখানে 'মিন-হা' (তা থেকে) শব্দটি দিয়ে এটা বোঝানো হয়নি যে, হাওয়াকে সরাসরি আদমের শরীর থেকে তৈরি করা হয়েছে। বরং এর অর্থ হলো, হাওয়াকে আদমের মতোই একই জাতি বা উৎস থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কুরআনের অন্য একটি আয়াতও এই বিষয়টিকে-ই সমর্থন করে:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

"আল্লাহই তোমাদের জন্য তোমাদের প্রজাতি থেকে স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন।"
(কুরআন, সুরা নাহল, ১৬: ৭২)

এই আয়াতে 'মিন আনফুসিকুম' (তোমাদের থেকে) শব্দটির আক্ষরিক অর্থ করলে দাঁড়ায় – 'আল্লাহই তোমাদের জন্য তোমাদের ভেতর থেকে স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন। যদি আমরা সুরা নিসার আয়াতের মতো এখানেও আক্ষরিক অর্থ ধরি, তবে এর অর্থ দাঁড়াবে – প্রতিটি স্ত্রীকে তার স্বামীর শরীর থেকেই তৈরি করা হয়েছে।কিন্তু এটি অবশ্যই ভুল।আসলে এই আয়াতে 'আনফুস' (নফসের বহুবচন) শব্দটি দিয়ে কোনো শারীরিক অংশ বোঝানো হয়নি, বরং এর অর্থ হলো 'একই প্রজাতি' বা 'একই সত্তা'। অর্থাৎ মানুষ হিসেবে নারী ও পুরুষ একই প্রকৃতির।

আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসটির ক্ষেত্রে একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া জরুরি – আরবি ভাষায় 'থেকে সৃষ্টি'বা 'থেকে তৈরি' কথাটি সবসময়ই যে কোনো বস্তুর মূল উপাদান বোঝায়, তা নয়; বরং অনেক সময় তা কোনো কিছুর স্বভাব বা প্রকৃতিকেও ইঙ্গিত করে। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে, 'মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাড়াহুড়ো করার প্রবণতা থেকে। (কুরআন, সুরা আম্বিয়া, ২১: ৩৭)। এর মানে এই নয় যে, মানুষের শরীরের উপাদান তাড়াহুড়ো; বরং এটা মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের কথা বলছে।

দ্বিতীয়ত, হাদিসের বিভিন্ন বর্ণনা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, এখানে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নারীর স্বভাবকে পাঁজরের হাড়ের বাঁকানো অবস্থার সঙ্গে তুলনা করেছেন।এই উপমাটি মূলত নারীর নাজুক, কোমল এবং আবেগপ্রবণ স্বভাবের ইঙ্গিত দেয়। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুরুষদের উপদেশ দিয়েছেন, নারীর এই স্বভাবের দিকে খেয়াল রেখে তাদের সঙ্গে কৌশলী ও ধৈর্যশীল আচরণ করতে।কোনো বিষয় জোর করে চাপিয়ে না দিয়ে বরং বোঝাপড়া ও সহমর্মিতার মাধ্যমে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক সুন্দর রাখার পরামর্শই এখানে দেওয়া হয়েছে।

বহুবিবাহ

অনেকে মনে করেন, ইসলামে চারজন পর্যন্ত বিয়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে কেবল পুরুষের শারীরিক ও মানসিক চাহিদা মেটানোর জন্য। কিন্তু এই ধারণাটি সঠিক নয়। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে একটি পরিবার একজন পুরুষ ও একজন নারীর বিয়ের মাধ্যমেই গঠিত হয়। কুরআনের সুরা নিসার ১ নম্বর আয়াতে একটি চমৎকার ইঙ্গিত রয়েছে – আল্লাহ যখন প্রথম মানব আদমকে সৃষ্টি করেছিলেন, তখন তার সঙ্গী হিসেবে হাওয়াকে এককভাবেই সৃষ্টি করেছিলেন।স্বাভাবিকভাবেই, পুরুষের জন্য যদি একাধিক স্ত্রী অপরিহার্য হতো, তবে আল্লাহ আদমকে কেবল একজন স্ত্রী না দিয়ে শুরুতেই একাধিক স্ত্রী দিতেন।

এ প্রসঙ্গে এটা বোঝা জরুরি যে, বহুবিবাহের বিষয়টি ইসলামে কোনো নতুন নিয়ম ছিল না; বরং তৎকালীন সমাজের একটি বড় সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে এটা এসেছে।সে সময় বিভিন্ন যুদ্ধে অনেক পুরুষ শহিদ হওয়ায় অনেক পরিবার অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছিল এবং অসংখ্য এতিম শিশু অসহায় হয়ে পড়েছিল। কুরআন তৎকালীন পুরুষদেরকে এতিম শিশুদের মায়েদের বিয়ে করার আহ্বান জানায়, যাতে তাদের অসহায়ত্ব দূর হয়।

কারণ, মায়েদের পাশে দাঁড়ালে এতিম শিশুদের সঠিক লালন-পালন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সহজ হয়।সহজ কথায়, বহুবিবাহ তখন থেকেই প্রচলিত ছিল, কিন্তু কুরআন এই প্রথাকে এতিমদের কল্যাণে ব্যবহারের একটি সুযোগ তৈরি করে দেয়।কুরআন এ বিষয়ে বলছে:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

“যদি তোমরা মনে করো যে, এতিমদের অধিকার রক্ষায় তোমরা সুবিচার করতে পারবে না, তবে তাদের মায়েদের মধ্য থেকে যাদের ভালো লাগে – এমন দুই, তিন বা চারজনকে বিয়ে করতে পারো। কিন্তু যদি ভয় হয় যে, তোমরা তাদের সবার সাথে সমান আচরণ করতে পারবে না, তবে কেবল একজনকেই বিয়ে করো অথবা তোমাদের অধীনস্থদের মধ্য থেকে করো।এটাই অবিচার এড়ানোর সহজ ও সঠিক পথ।আর নারীদের তাদের মোহরানা খুশি মনে প্রদান করো; তবে তারা যদি নিজের ইচ্ছায় মোহরানার কিছু অংশ তোমাদের ছেড়ে দেয়, তবে তা সানন্দে গ্রহণ করতে পারো।”

(কুরআন, সুরা নিসা, ৪: ৩-৪)

আমাদের এটা বুঝতে হবে যে, বহুবিবাহের অনুমতি মূলত তৎকালীন সমাজের নানা সামাজিক, মানসিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে এসেছিল।বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন সময়ে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে এই প্রথার প্রয়োজন ছিল।আল্লাহতায়ালা তাঁর শরিয়তে এই প্রথাকে সরাসরি নিষিদ্ধ করেননি; বরং আলোচ্য আয়াতগুলোতে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন এই প্রথাকে ব্যবহার করে সেই সময়কার বিশেষ সামাজিক সমস্যাগুলো সমাধান করা হয়।

তবে একটি বিষয় খুব স্পষ্টভাবে মনে রাখা জরুরি – কুরআন অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি যদি নিজের স্ত্রীদের মধ্যে সমান অধিকার ও সুবিচার বজায় রাখতে না পারে, তবে তার একাধিক বিয়ে করা একেবারেই উচিত নয়; এমনকি এতিমদের সাহায্য করার মতো মহৎ উদ্দেশ্যেও নয়। মানুষের সহজাত প্রকৃতি অনুযায়ী কোনো নির্দিষ্ট স্ত্রীর প্রতি কারো মন বেশি টানতে পারে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে সব স্ত্রীর সাথে সমান ও ন্যায্য আচরণ করা বাধ্যতামূলক।কুরআন এই বিষয়টি আরও পরিষ্কারভাবে বলেছে:

وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

“তোমরা শত চেষ্টা করলেও স্ত্রীদের মধ্যে সব দিক থেকে সমান ইনসাফ বা ন্যায়বিচার বজায় রাখতে পারবে না। তাই তোমরা কোনো একজনের প্রতি পুরোপুরি ঝুঁকে পড়ে অন্যজনকে এমন অবস্থায় ফেলে রেখো না যে, সে না বিয়ের বন্ধনে পুরোপুরি আবদ্ধ থাকে, না ছাড়া পায়। যদি তোমরা নিজেদের সংশোধন করো এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো, তবে জেনে রেখো – আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু। আর যদি (সব চেষ্টার পরও) তাদের মাঝে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাঁর অসীম দয়া ও প্রাচুর্য দিয়ে উভয়কেই অভাবমুক্ত করবেন।নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও প্রজ্ঞাময়।”

(কুরআন, সুরা নিসা, ৪: ১২৯-১৩০)

নারীরা প্রায়ই প্রশ্ন করেন যে, পুরুষদের একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি থাকলেও তাদের কেন একাধিক স্বামী রাখার অনুমতি নেই।এর পেছনে একটি যৌক্তিক কারণ রয়েছে।

একটি পরিবার সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য একজন অভিভাবক থাকা জরুরি। যেমন – একটি রাষ্ট্রে একাধিক শাসক থাকলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, তেমনি একটি পরিবারে একাধিক অভিভাবক থাকলে সেখানেও চরম অরাজকতা দেখা দেবে। ইসলামি পারিবারিক কাঠামোতে স্বামীকে পরিবারের অভিভাবক বা দায়িত্বশীল করা হয়েছে। সুতরাং, একজন স্ত্রীর যদি একাধিক স্বামী থাকত, তবে তাকে একই সঙ্গে অনেকের কর্তৃত্বের অধীনে থাকতে হতো, যা পারিবারিক ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা ও জটিলতা সৃষ্টি করত।

জীবন ও কর্ম

জ্ঞানের তিন ধ্রুবতারা

ড. শেহজাদ সেলিম

ইমাম হামিদুদ্দিন ফারাহি

১৮৬৩ সাল। আজমগড় জেলার ছোট্ট এক গ্রাম ফারিহা। এই গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন হামিদুদ্দিন ফারাহি–গ্রামের নাম থেকেই তার নামের এই ফারাহি অংশটুকু নেওয়া। তিনি ছিলেন বিখ্যাত ধর্মতাত্ত্বিক-ইতিহাসবিদ শিবলি নুমানির চাচাতো ভাই। আরবি ভাষার তালিমটা তিনি তার কাছেই পেয়েছিলেন। এরপর আরবি সাহিত্যের ঝানু পণ্ডিত ফয়জুল হাসান সাহারানপুরির কাছে তিনি আরবি সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেন। একুশ বছর বয়সে আধুনিক জ্ঞানের দুনিয়ায় নিজেকে ঝালিয়ে নিতে তিনি ভর্তি হন আলিগড় মুসলিম কলেজে। সেখানেই জার্মান প্রাচ্যবিদ জোসেফ হোরোভিৎজের কাছে তিনি হিব্রু ভাষা শিখেছিলেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করে তিনি আলিগড় ও দারুল উলুম হায়দ্রাবাদসহ নানা জায়গায় শিক্ষকতা করেছেন।

দারুল উলুম হায়দ্রাবাদে থাকার সময় তার মাথায় এক অদ্ভুত সুন্দর আইডিয়া আসে। এমন একটা বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া দরকার যেখানে উর্দু ভাষাতেই সব ধরণের ধর্মীয় ও আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া যাবে। ১৯১৯ সালে তার এই স্বপ্ন সত্যি হয় – হায়দ্রাবাদের জামিয়া উসমানিয়া।

১৯২৫ সালে তিনি নিজের শহর আজমগড়ে ফিরে আসেন এবং মাদ্রাসা আল-ইসলাহর দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। মাদ্রাসা চালানোর পাশাপাশি তিনি তার বেশিরভাগ সময়টাই দিতেন কিছু শিক্ষার্থীকে তৈরি করার কাজে। তাদের মধ্যেই একজন ছিলেন আমিন আহসান ইসলাহি। তিনি ছিলেন ফারাহির চিন্তাধারার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকারী। ১৯৩০ সালের ১১ নভেম্বর মিথরায় এই মানুষটি মৃত্যুবরণ করেন।

হামিদুদ্দিন ফারাহি নামের এই মানুষটি প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে কুরআন নিয়ে এক গভীর ধ্যানের জগতে ডুবে ছিলেন।তার সবচাইতে বড় কৃতিত্ব হলো, তিনি আলেমদের চোখ ফিরিয়ে এনেছিলেন কুরআনের দিকে – কুরআন যে নিজেই নিজের চূড়ান্ত বিচারক, এই সত্যটা তিনি নতুন করে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, কুরআন হলো মিজান, যা দিয়ে সত্য-মিথ্যা ওজন করা যায়; আবার ফুরকান, যা দিয়ে ভালো আর মন্দকে আলাদা করা সম্ভব। তার মতে, হাদিস কোনোভাবেই কুরআনকে পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে না; বরং হাদিসকে বুঝতে হবে কুরআনের আলোয়, কুরআনের উল্টো পিঠে দাঁড়িয়ে নয়। এই যে কুরআনের মর্যাদা, তা রক্ষা করতেই তিনি কুরআনের ঐক্যের ওপর প্রচণ্ড জোর দিয়েছেন, এমনকি বিভিন্ন কিরাতকেও তিনি কুরআন হিসেবে মানতে রাজি হননি।

কুরআন নিয়ে তার এই দীর্ঘ সাধনা তাকে নাজম বা কুরআনের ভেতরকার এক অলৌকিক সংহতি খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিল। তিনি নাজমের তিনটি মূল উপাদান – তারতিব, তানাসুব আর ওয়াহদানিয়্যাহ – দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন যে, কুরআনের সুনির্দিষ্ট একটা ব্যাখ্যা সম্ভব। আমরা যে দেখি একেক দল একেকভাবে কুরআনকে ব্যাখ্যা করে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছে, তার কারণ একটাই – আমরা আয়াতের প্রেক্ষাপট আর এর ভেতরের সংহতিকে পুরোপুরি এড়িয়ে গেছি।অথচ কুরআনের এই সংহতির কথা যদি আমরা বুঝতাম, তবে এর অর্থ নিয়ে আর কোনো গোলমাল থাকতো না।

মানুষটি শুধু যে কুরআনের গভীর অর্থ খুঁড়ে বের করেছেন তা না, কুরআনের ভাষা বোঝার জন্য আরবি ভাষার অনেকগুলো শাখাকেও তিনি নতুন করে সাজিয়ে লিখেছিলেন। হামিদুদ্দিন ফারাহির বেশির ভাগ কাজই আরবি ভাষায়। অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার হলো, তার লেখা বইয়ের বড় একটা অংশই রয়ে গেছে অসমাপ্ত নোট আকারে। খুব কম কাজই তিনি পুরোপুরি শেষ করে যেতে পেরেছেন। যেমন 'মাজমুআ তাফাসির-ই ফারাহি' – এখানে চৌদ্দটি সুরার ব্যাখ্যা আছে। 'মুফরাদাত আল-কুরআন'-এ তিনি কুরআনের কঠিন সব শব্দের মানে বুঝিয়েছিলেন। ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম)-এর কুরবানির ঘটনা নিয়ে ইহুদিদের দাবির বিপরীতে তিনি লিখেছেন 'আর-রায় আল-সহিহ ফি মান হুওয়াজ জাবিহ'। এছাড়া 'জামহারাতলি বালাগা' বা 'আসালিব আল-কুরআন'-এর মতো বইগুলোতে তিনি কুরআনের অলঙ্কারশাস্ত্র আর বিশেষ শৈলী নিয়ে কাজ করেছেন। আরবি আর ফারসি ভাষায় তিনি যে সমান দক্ষ ছিলেন, তা তার কাব্যকর্মেই ফুটে উঠেছে।

সব মিলিয়ে তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ এই গবেষণার বাইরেও প্রায় বিশটার মতো কাজ রয়ে গেছে অসমাপ্ত। কেউ যদি একটু যত্ন নিয়ে এগুলো শেষ করতো, তবে হয়তো আমাদের জ্ঞানের জগতটা আরও কিছুটা সমৃদ্ধ হতো।

আমিন আহসান ইসলাহি

১৯০৪ সাল। ভারতের উত্তরপ্রদেশের আজমগড় জেলার এক ছোট্ট গ্রাম বামহুর। এই গ্রামেই জন্ম নেন আমিন আহসান ইসলাহি। ১৯২২ সালে তিনি মাদ্রাসা আল-ইসলাহ থেকে পড়াশোনা শেষ করেন। ছাত্রজীবনে তার ওপর সবচেয়ে বড় প্রভাব ফেলেছিলেন আবদুর রহমান নিগ্রামি নামের এক অসাধারণ শিক্ষক। নিগ্রামি সাহেবের ছোঁয়ায় ইসলাহির ভেতরে আরবি সাহিত্যের প্রতি এক গভীর ভালোবাসা জন্মেছিল। মাদ্রাসা জীবন শেষে তিনি সাংবাদিকতার জগতে পা রাখেন। বিজনাওরের 'মদিনা' পত্রিকা আর প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব আবদুল মজিদ দরিয়াবাদির 'সাচ' পত্রিকার সাথে যুক্ত হয়ে তিনি সাংবাদিকতায় নিজের হাত পাকান।

তবে তার জীবনের মোড় ঘুরে যায় ১৯২৫ সালে। এই বছর থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর তিনি ছিলেন হামিদুদ্দিন ফারাহির ছায়াসঙ্গী। জীবনের এই সময়টাই ছিল তার নিজেকে গড়ার সময়। ফারাহির কাছেই তিনি কুরআন নিয়ে গবেষণার গভীর সব মূলনীতি শিখেছিলেন। ফারাহির মৃত্যুর পর তিনি হাদিসের ওপর পড়াশোনা করতে গিয়ে যোগ দেন আবদুর রহমান মুহাদ্দিস মুবারকপুরির কাছে। ১৯৩৬ সালে তিনি গড়ে তোলেন 'দায়েরা-ই হামিদিয়্যাহ' নামে ছোট এক প্রতিষ্ঠান। সেখান থেকে 'আল-ইসলাহ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের হতো, যেখানে ফারাহির অনেক আরবি প্রবন্ধ তিনি বাংলায় অনুবাদ করে পৌঁছে দিতেন মানুষের কাছে।

১৯৪১ সালে তিনি যোগ দিলেন আবুল আলা মওদুদি প্রতিষ্ঠিত 'জামায়াতে ইসলামি'তে, ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। কিন্তু ১৯৫৮ সালে জামায়াতের গঠনতন্ত্র নিয়ে মওদুদি সাহেবের সাথে তার মতপার্থক্য তৈরি হয়, একসময় তিনি দল ছেড়ে বেরিয়ে আসেন।

জামায়াত থেকে বেরিয়ে আসার পরেই তিনি তার জীবনের লালিত স্বপ্ন – কুরআনের তাফসির বা ব্যাখ্যা লেখার মূল কাজে হাত দেওয়ার সুযোগ পান। তিনি 'মিসাক' নামে একটি পত্রিকা চালু করেন, আর সেখানে তার দীর্ঘদিনের সাধনার ফসল 'তাদাব্বুরে কুরআন' প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৬১ সালে তিনি কলেজ ছাত্রদের নিয়ে তৈরি করেন 'হালকা তাদাব্বুরে কুরআন' নামে ছোট এক চক্র। সেখানে তিনি ছাত্রদের পড়াতেন আরবি ভাষা, সাহিত্য, কুরআন আর ইমাম মুসলিমের সহিহ হাদিস। শাহ ওয়ালিউল্লাহর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' কিংবা ইবনে খালদুনের 'মুকাদ্দিমাহ'-র মতো গম্ভীর সব বিষয়ও তিনি অতি সহজ করে ছাত্রদের সামনে তুলে ধরতেন। মানুষটি ছিলেন নিরন্তর এক জ্ঞানপিপাসু।

১৪০০ হিজরির ২৯ রমজান, অর্থাৎ ১৯৮০ সালের ১২ই আগস্ট – দিনটি ছিল বিশেষ। দীর্ঘ বাইশ বছরের এক বিশাল কর্মযজ্ঞের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল সেদিন। শেষ হয়েছিল 'তাদাব্বুরে কুরআন'-এর কাজ।

এটা কেবল একটি বই ছিল না, ছিল এক কালজয়ী মাস্টারপিস।নিজের শিক্ষক ফারাহির মূলনীতিগুলোকে তো তিনি ধারণ করেছিলেনই, সেই সাথে মিশিয়েছিলেন নিজের মৌলিক চিন্তার এক অসাধারণ প্রলেপ। তাফসিরের দুনিয়ায় এক নতুন যুগের সূচনা হলো যেন এই বইটির হাত ধরেই।

ইসলাহি তার এই বিশাল কাজে কুরআনের আয়াতের ভেতরেই লুকিয়ে থাকা এক রহস্যময় শৃঙ্খলা খুঁজে পেয়েছিলেন।তিনি দেখালেন, আল্লাহতায়ালা নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর দাওয়াতের মিশনকে সামনে রেখে পুরো কুরআনকে সাতটি আলাদা গ্রুপে সাজিয়েছেন।প্রতিটি গ্রুপের একটা মূল বিষয়বস্তু আছে, আর সেই সুবাদেই সুরাগুলোকে সাজানো হয়েছে জোড়ায় জোড়ায়।প্রতিটি সুরার আবার নিজের একটা সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু আছে, যা পুরো সুরার সারমর্ম।

১৯৮১ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন 'ইদারা তাদাব্বুরে কুরআন-ও হাদিস'।১৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এটাই ছিল তার সব কাজের কেন্দ্রবিন্দু।১৯৮১ থেকে 'তাদাব্বুর' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকাও নিয়মিত বের হতে থাকল।প্রতি সপ্তাহে তিনি কুরআনের ওপর লেকচার দিতেন।এরপর তিনি মনোযোগ দিলেন হাদিসের গভীরে।একদল ঘনিষ্ঠ ছাত্র ও সহযোগীকে নিয়ে তিনি শুরু করলেন ইমাম মালেকের 'আল-মুয়াত্তা' পাঠ।সেটা শেষ হলে তিনি হাত দিলেন ইমাম বুখারির 'আল-জামি আস-সহিহ'-তে।

'তাদাব্বুরে কুরআন' ছাড়াও তিনি উর্দূতে প্রচুর লিখেছেন।তার লেখা বইগুলোর তালিকা বেশ লম্বা – 'তাজকিয়ায়ে নাফস', 'হাকিকাতে শিরক-ও তাওহিদ', 'ইসলামের দাওয়াত ও তার প্রচার পদ্ধতি', 'ইসলামি রিয়াসাত', 'কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনার মৌলিক নীতি', 'হাদিস নিয়ে চিন্তাভাবনার মৌলিক নীতি', 'ইসলামি রাষ্ট্রে ফিকহি মতপার্থক্যের সমাধান' আর 'ইসলামি আইন সংকলন'। শুধু নিজের লেখাই নয়, ফারাহির লেখা আরবি বইগুলোকেও তিনি অসামান্য দক্ষতায় অনুবাদ করেছিলেন – যেমন 'ইব্রাহিমের কোন সন্তানকে কুরবানি করা হয়েছিল' এবং 'কুরআনের শপথসমূহ'। মানুষটি যেন জীবনভর কেবল জ্ঞান আর গবেষণার নেশাতেই ডুবে ছিলেন।

জাভেদ আহমেদ গামিদি

জাভেদ আহমেদ গামিদির জীবনটা বেশ ঘটনাবহুল। ১৯৫১ সালে পাঞ্জাবের সাহিওয়াল জেলার এক গ্রামে তার জন্ম। পড়াশোনার হাতেখড়ি গ্রামের স্কুলেই, কিন্তু ১৯৬৭ সাল থেকে তিনি লাহোরের মানুষ। এরপর লাহোরের গভর্নমেন্ট কলেজে পড়াশোনা শেষ করে তিনি গভীর মনোযোগ দিলেন ইসলামি শাস্ত্রের ওপর। ১৯৭৩ সালে আমিন আহসান ইসলাহির সংস্পর্শে এসে তার চিন্তার জগতে বড় ধরনের পরিবর্তন আসে। আবার প্রখ্যাত সংস্কারক আবুল আলা মওদুদি সাহেবের সাথেও তিনি বেশ কিছু বছর কাজ করেছেন। দীর্ঘ সময় – প্রায় দশকের বেশি – তিনি সিভিল সার্ভিস একাডেমিতে ইসলামিয়াত পড়িয়েছেন।

এখন তিনি 'আল-মাওরিদ'-এর কর্ণধার, বের করেন 'আল-ইশরাক' আর 'রেনেসাঁ'-এর মতো পত্রিকা। মানুষ তাকে এখনকার প্রজন্মের কাছে চেনে মূলত টিভি টকশোর সেই মানুষটি হিসেবে, যিনি ইসলাম নিয়ে সমসাময়িক সব জটিল প্রশ্নের সহজ উত্তর দেন।

গামিদির পড়াশোনার শিকড়টা মূলত হামিদুদ্দিন ফারাহি আর আমিন আহসান ইসলাহির চিন্তাধারায় পোঁতা। সেখান থেকে রসদ নিয়ে তিনি নিজের মতো করে নতুন পথ তৈরি করেছেন। তার করা কুরআনের অনুবাদ 'আল-বায়ান'-এর দিকে তাকালে সেটা পরিষ্কার বোঝা যায়। তিনি মূল আরবির কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করেছেন – শব্দের বাহুল্য কমিয়ে তিনি পাঠকের বুদ্ধির ওপর বিশ্বাস রেখেছেন।

গামিদির সবচেয়ে বড় মৌলিক কাজ হলো ধর্মের বিষয়গুলোকে সুন্দরভাবে সাজানো।তিনি কুরআন ঘেঁটে ইসলামকে দুটো ভাগে ভাগ করেছেন – 'হিকমা' আর 'শরিয়া'। হিকমা হলো ধর্মের দর্শনের দিক, আর শরিয়া হলো আইন। আবার এই শরিয়াকে তিনি দশটি ভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন – ইবাদত থেকে শুরু করে জিহাদ, দণ্ডবিধি কিংবা নাগরিকত্বের আইন। নারীর সাক্ষ্য, উত্তরাধিকার কিংবা দাসপ্রথার মতো স্পর্শকাতর বিষয়গুলোতে তিনি একদম নতুন করে দেখার জানালা খুলে দিয়েছেন।

তার চিন্তাগুলো আরও গভীরে বুঝতে চাইলে পড়তে হয় 'উসুল-ও মাবাদি (মূলনীতি)'। সেখানেই তিনি দেখিয়েছেন, ইসলাম বোঝার নিয়মটা কেমন হওয়া উচিত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, হাদিসকে তিনি কুরআনের আলোয় দেখার ওপর জোর দেন। শরিয়া আর ফিকাহ-এর মধ্যকার পার্থক্য নিয়েও তিনি কাজ করেছেন।শরিয়া হলো আল্লাহর দেওয়া বিধান, আর ফিকাহ হলো মানুষের সেই বিধান নিয়ে চিন্তাভাবনা। 'মিজান' বইয়ে তিনি এই পার্থক্যটা খুব স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

আবার সুন্নাত আর হাদিসের মধ্যে যে সূক্ষ্ম ফারাক, তা নিয়েও তিনি কাজ করেছেন।'সত্য ধর্ম' প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন ইসলামটা আসলে কী – যেখানে তিনি তাসাউফ বা কেবল জিহাদ-ভিত্তিক ইসলামের গণ্ডি ছাড়িয়ে এক পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শনের কথা বলেছেন। এছাড়া 'বুরহান' আর 'মাকামাত'-এর মতো বইয়ে তিনি সমাজ ও সাহিত্যের সমসাময়িক সমস্যাগুলো নিয়ে কলম ধরেছেন। মানুষটি জীবনভর কেবলই কুরআনের আলোয় নতুন পৃথিবী খুঁজে পাওয়ার সাধনা করে গেছেন এবং যাচ্ছেন।

সাক্ষাৎকার

ইসলাম ও মুসলিমদের ইতিহাস, মৌলিক বই ও বরেণ্য ব্যক্তিত্ব – নাইম আহমেদ বালুচ-এর একান্ত সাক্ষাৎকার

নাইম বালুচ

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুবাদ: মোহাম্মদ সিয়াম হোসেন

[উপমহাদেশের সমকালীন জ্ঞানচর্চার আকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র নাইম আহমেদ বালুচ। তিনি একাধারে ইতিহাসবিদ, গভীর জীবনবোধসম্পন্ন ইসলামি গবেষক এবং শক্তিমান উর্দু সাহিত্যিক। তার লেখনীর পরিধি যেমন বিস্তৃত, তেমনই গভীর। বিশেষ করে শিশুসাহিত্যের আঙিনায় তিনি এক অনন্য নাম; কোমলমতি শিশুদের মনস্তত্ত্ব ও নৈতিকতা গঠনে তিনি রচনা করেছেন ৩৫টিরও বেশি চমৎকার বই।এছাড়াও উপন্যাস, মৌলিক গবেষণা ও সম্পাদনা মিলিয়ে তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় অর্ধশত।

কেবল নিভৃতচারী গবেষক হিসেবেই নয়, একজন সফল মিডিয়া ব্যক্তিত্ব হিসেবেও তার দারুণ খ্যাতি রয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে তিনি পাকিস্তানের বিভিন্ন মূলধারার টেলিভিশন চ্যানেলে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন এবং ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে গণমানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছেন। তার এই যুগান্তকারী গবেষণামূলক কর্মের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি 'আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়' এবং 'ন্যাশনাল বুক কাউন্সিল' কর্তৃক শ্রেষ্ঠ লেখকের মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। বর্তমানে তিনি গামিদি সেন্টার অব ইসলামিক লার্নিং (GCIL)-এ ইতিহাস গবেষক হিসেবে কর্মরত আছেন।]

মোহাম্মদ সিয়াম: আসসালামু আলাইকুম। জনাব নাইম বালুচ, আমাদের এই বিশেষ সাক্ষাৎকারে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হলো – ইসলামি ইতিহাস, এর মূল আকর গ্রন্থসমূহ এবং এই ক্ষেত্রে অবদান রাখা মহান ব্যক্তিত্বগণ। আপনার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন – 'ইসলামি ইতিহাস' এবং 'মুসলিম ইতিহাস' – এই দুটির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কী? একই সাথে, এই ইতিহাস অধ্যয়নের মৌলিক গ্রন্থগুলো সম্পর্কেও আপনার কাছ থেকে বিস্তারিত জানতে চাই।

ইসলামি ইতিহাস বনাম মুসলিম ইতিহাস

জনাব নাইম বালুচ: আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি প্রথমে 'ইসলামি ইতিহাস' এবং 'মুসলিম ইতিহাস'-এর মধ্যকার মৌলিক পার্থক্যটি ব্যাখ্যা করছি।

ইসলামি ইতিহাস হলো মূলত ইসলামের ইতিহাস। অর্থাৎ হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত সকল নবী-রাসুলগণের ইতিহাস, তাদের সিরাত (জীবনচরিত) এবং ইসলাম প্রচার ও প্রসারে তাদের অবলম্বন করা কর্মপন্থা ও কৌশলের বিবরণ। তাদের সময়কার পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট কেমন ছিল, তার বিস্তারিত আলোচনা এর অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামি ইতিহাসের উৎস

এই ইতিহাসের প্রধান উৎস হলো কুরআন মাজিদ এবং বাইবেল। ইসলাম-পূর্ব নবীগণের ইতিহাস জানার জন্য বর্তমানে বাইবেল অন্যতম মাধ্যম হলেও একজন মুসলিম ও ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে এটা স্বীকৃত যে, বর্তমান বাইবেল মূলত একটি সংকলন মাত্র। এটা ইতিহাস, আসমানি কিতাব এবং বিভিন্ন পরিস্থিতির সংমিশ্রণ, যেখানে ঐশী শিক্ষার অংশটুকু খুবই সীমিত। তাই ইসলামি ইতিহাসের প্রকৃত উৎস হিসেবে কুরআনকেই মানদণ্ড ধরা হবে। নবীগণের ইতিহাসের বাকি অংশটুকু আমরা কুরআনের আলোকে যাচাই করব।

যা কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এবং ইসলামের মৌলিক শিক্ষার পরিপন্থী নয়, তা গ্রহণ করতে আমাদের কোনো বাধা নেই। সুতরাং, কুরআন মাজিদ এবং বাইবেলে বর্ণিত নবীগণের ঘটনাবলিই হলো ইসলাম-পূর্ব ইসলামি ইতিহাসের মূল উপাদান।

এর পরবর্তী যে ইতিহাস, তাকে বলা হবে মুসলিম ইতিহাস। আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইন্তেকালের পর প্রথম যে ঘটনাটি ঘটেছিল – সাকিফা বনি সায়েদাতে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর খিলাফতের সূচনা। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমানদের যে অবস্থা, সাহাবায়ে কেরামের জীবনকাল, খুলাফায়ে রাশেদিন এবং পরবর্তীকালের মুসলিম শাসনব্যবস্থা ও তাদের কর্মকাণ্ড – এসবই 'মুসলিম ইতিহাস' হিসেবে গণ্য হবে; একে 'ইসলামি ইতিহাস' বলা যাবে না।

এই মৌলিক পার্থক্যটি অনেক সময় গুলিয়ে ফেলা হয়।মুসলিম শাসকদের সব কর্মকাণ্ডকে যদি আমরা ইসলামি ইতিহাস মনে করি, তবে তার দায়ভার ইসলামের উপর বর্তায় – যা সঠিক নয়।ইসলামের দায়ভার বা প্রতিনিধিত্ব কেবল নবী (আলাইহিস সালাম)-গণের সময়কাল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। এরপর মুসলিম ইতিহাসে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তার দায়ভার মুসলমানদের।সেখানে যেমন অনেক মহৎ কাজ রয়েছে, তেমনি অনেক বিষয়ে সমালোচনাও হতে পারে।

ইতিহাসের মৌলিক উৎস গ্রন্থ

মুসলিম ইতিহাসের যাত্রা শুরু হয় মূলত আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনচরিত তথা সিরাত এবং 'মাগাজি' (নবীর সময়কার যুদ্ধের ঘটনাবলি)-র মাধ্যমে। এই শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপনকারী প্রধান উৎস গ্রন্থসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো:

সাক্ষাৎকার

- ইবনে ইসহাকের সংকলন: তিনি অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে সিরাত ও মাগাজির বিবরণ সংকলন করে এই ধারার সূচনা করেন। তার সংকলনে প্রচুর কবিতা এবং নানা ধরনের বর্ণনা রয়েছে। তবে এটা আধুনিক নিয়মে সম্পাদিত ইতিহাস গ্রন্থ ছিল না, বরং তার কাছে নবীজির জীবন সম্পর্কে যে তথ্য পৌঁছেছিল, তিনি তারই একটি বিস্তারিত রূপ তুলে ধরেছেন।
- সিরাত আন-নববিয়্যাহ (ইবনে হিশাম): এটা ইবনে ইসহাকের বিশাল কাজের একটি পরিমার্জিত রূপ ও সারসংক্ষেপ।
- মাগাজি (ওয়াকিদি): যুদ্ধসংক্রান্ত ইতিহাসের ক্ষেত্রে এটা একটি বড় উৎস। তবে ওয়াকিদির বর্ণনার উপর অনেকে সমালোচনা করেন যে, সেখানে শিয়া মতাদর্শের প্রভাব এবং তথ্যের কিছুটা মিশ্রণ ঘটেছে।
- তাবাকাতে কুবরা (ইবনে সাদ): এটা একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ গ্রন্থ, যেখানে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সিরাত ছাড়াও সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়িগণের জীবনবৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।
- তারিখুর রুসুল ওয়াল মুলুক (জারির তাবারি): সাধারণ বা বিশ্ব-ইতিহাসের ক্ষেত্রে এটা সবার আগে আসবে। 'নবী ও রাজাদের ইতিহাস' নামের এই অমর সৃষ্টিটি মুসলিম ইতিহাসের সবচেয়ে মহান এবং মৌলিক উৎস গ্রন্থ। একে নিঃসংকোচে 'উম্মাহাতুল কুতুব' বা প্রধান উৎস গ্রন্থের তালিকায় শীর্ষে রাখা যায়।
- ফুতুহুল বুলদান (বালাজুরি): 'বিভিন্ন দেশ জয়ের ইতিহাস' সংক্রান্ত এই গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রামাণ্য। বিশেষ করে খুলাফায়ে রাশেদিনের সময়কার মুসলিম বিজয়সমূহ এবং তৎকালীন ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বোঝার জন্য এটা পাঠ করা অপরিহার্য।
- তারিখে ইয়াকুবি (ইয়াকুবি): এটা একটি প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থ, তবে এতে শিয়া দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

- মুকাদ্দিমা (ইবনে খালদুন): ইবনে খালদুন কেবল মুসলিম ইতিহাসেরই নন, বরং ইতিহাস দর্শনের একজন পথপ্রদর্শক।ইতিহাস কীভাবে লিখতে হয় এবং ইতিহাসের মূলনীতি কেমন হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে তার এই 'ভূমিকা' গ্রন্থটি একটি বিশ্বজয়ী মাস্টারপিস। এটা ছাড়া ইতিহাস বোঝা প্রায় অসম্ভব।
- আল-কামিল ফিত তারিখ (ইবনে আসির): পরবর্তী সময়ের গ্রন্থগুলোর মধ্যে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা মূলত জারির তাবারির ধারাকেই সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

এছাড়াও এই সিলসিলায় ইমাম যাহাবি এবং ইবনে কাসির-এর নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এগুলোই হলো মুসলিম ইতিহাসের সেই সকল মৌলিক উৎস গ্রন্থ বা 'উম্মাহাতুল কুতুব', যা এই শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেছে।

মোহাম্মদ সিয়াম: আমরা যেহেতু ইতিহাসকে 'ইসলামি ইতিহাস' এবং 'মুসলিম ইতিহাস' – এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছি এবং পূর্ববর্তী আলোচনায় আপনি মুসলিম ইতিহাসের উৎস গ্রন্থগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন; তাহলে পবিত্র কুরআনের আলোকে ইসলামের যে ইতিহাস বা সিরাত, তার আকর গ্রন্থ ও উৎসগুলো কী কী? অনুগ্রহ করে এ বিষয়ে আমাদের বিস্তারিত জানাবেন।

জনাব নাইম বালুচ: পবিত্র কুরআনের আলোকে ইসলামের ইতিহাস এবং বিশেষ করে সিরাত রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাষায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক কাজ হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো:

আরবি ভাষার গ্রন্থসমূহ

- সিরাতুর রাসুল (মুহাম্মদ ইজ্জত দারওয়াজা): আরবি ভাষায় কুরআনের ভিত্তিতে সিরাত রচনার ক্ষেত্রে এটা প্রথম এবং অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এটাই মূলত কুরআনের উপর ভিত্তি করে লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ সিরাত গ্রন্থ, যা দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

- সিরাতুন নবী ফি জাবিল কুরআন ওয়াস সুন্নাত (মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আবু শুবহাহ): 'দারুল কলম' থেকে দুই খণ্ডে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি এ বিষয়ের আরেকটি আকর গ্রন্থ।প্রায় একই শিরোনামে আব্দুল মাহদি বিন আব্দুল কাদির বিন আব্দুল হাদিরও একটি চমৎকার গ্রন্থ রয়েছে।
- ফিকহুস সিরাত (মুহাম্মদ আল-গাজালি): এটাকে পুরোপুরি কুরআনের ভিত্তিতে লেখা সিরাত গ্রন্থ না বলা গেলেও, এতে তাত্ত্বিক, দাওয়াতি এবং নৈতিক ফলাফল বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনকে প্রধান মানদণ্ড হিসেবে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ সিরাতের বর্ণনায় কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গিকে এখানে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

উর্দু ও ফারসি ভাষার গ্রন্থসমূহ

ফারসি ভাষার কাজ: ফারসি ভাষায় শিয়া ঘরানার আলেমদের এই নির্দিষ্ট বিষয়ে বেশ কিছু কাজ রয়েছে।

- সিরাতুন নবী কুরআনের আলোতে / সিরাতুন নবী কুরআন কি রশনি মে (মাওলানা আব্দুল মজিদ দরিয়াবাদি): উর্দুতে এই নির্দিষ্ট বিষয়ে খুব বেশি কাজ না হলেও মাওলানা আব্দুল মজিদ দরিয়াবাদির এই কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যদিও বইটি খুব বেশি সুবিশাল বা বিস্তারিত নয়।
- তালেব হোসেন করপালভির গ্রন্থসমূহ: সিরাত নিয়ে এই শিয়া লেখকের দুটি উল্লেখযোগ্য বই রয়েছে – 'সিরাতুন নবী ফুরকানে হামিদের আলোকে' এবং 'সিরাতুন নবী কুরআন মাজিদের আলোকে'।
- মাওলানা আবুল আলা মওদুদির সংকলন: মাওলানা মওদুদি সিরাতের ওপর আলাদা করে কোনো সুবিশাল গ্রন্থ লেখেননি।তবে তার 'তাফহিমুল কুরআন' এবং সিরাত বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধকে এক জায়গায় সংকলিত করা হয়েছে। এই সংকলনে নবীজির জীবনের কুরআনিক বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে; যা মূলত কুরআন ও রেওয়ায়েতের একটি সমন্বয় বা সংমিশ্রণ।

আধুনিক ও অগ্রসর কাজ

- হায়াতে রাসুলে উম্মি (মাওলানা খালিদ মাসউদ): কুরআনের আলোকে সিরাত রচনার ক্ষেত্রে এটাকে সবচেয়ে অগ্রসর ও আধুনিক কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটা বর্তমানে ইংরেজিতে 'The Life of the Holy Prophet' নামেও অনূদিত হয়েছে।

মোহাম্মদ সিয়াম: ইসলামি ইতিহাস ও মুসলিম ইতিহাসের মধ্যকার মৌলিক পার্থক্য এবং এর আকর গ্রন্থগুলোর বিস্তারিত বিবরণের জন্য ধন্যবাদ।ইতিহাস পাঠ বা অধ্যয়নের বিশেষ কোনো মূলনীতি বা পদ্ধতি রয়েছে কি? যদি থাকে, তবে সেই নীতিগুলো কী এবং ইতিহাস পড়ার সময় আমরা কীভাবে এগুলো প্রয়োগ করতে পারি? এই বিষয়ে অনুগ্রহ করে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা দিন।

জনাব নাইম বালুচ: ইতিহাস অধ্যয়নের মূলত ৭টি মূলনীতি রয়েছে। এই নীতিগুলো অনুসরণ করলে আমাদের ইতিহাসবোধ অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য হবে এবং পঠিত ইতিহাস সত্যের কতটা কাছাকাছি, তা সহজেই অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

ইতিহাসের দুটি প্রধান ধরন

মূলনীতিগুলো আলোচনার পূর্বে এটা স্পষ্ট করা প্রয়োজন যে, ইতিহাসের ঘটনাবলি মূলত দুই প্রকার:

- স্বীকৃত বা ধ্রুব ইতিহাস: যে বিষয় বা ঐতিহাসিক সত্যগুলো নিয়ে কোনো ধরনের দ্বিমত নেই। যেমন – বাংলাদেশ আগে পাকিস্তানের অংশ ছিল এবং 'পূর্ব পাকিস্তান' নামে পরিচিত ছিল।১৯৭১ সালে একটি নির্বাচনের ফলাফলের পর সেখানে একটি বিশেষ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।এটা একটি ধ্রুব সত্য বা স্বীকৃত ইতিহাস।

- ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্য বা বর্ণনার ইতিহাস: যেখানে দৃষ্টিভঙ্গি ও আদেশভেদে একই ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়।যেমন – উপরোক্ত ঘটনাটিকে বাংলাদেশের মানুষ 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' বলবেন; পক্ষান্তরে অন্য কোনো পক্ষ তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ভিন্ন শব্দ বা ব্যাখ্যা ব্যবহার করতে পারে। পশ্চিম পাকিস্তানের পাঠ্যপুস্তকে এই ঘটনার যে বিবরণ বা প্রেক্ষাপট পড়ানো হয়, বাংলাদেশে তার বিবরণ ভিন্ন।এটাই হলো বহুমুখী ভাষ্যের ইতিহাস।

ইতিহাস অধ্যয়নের ৭টি মূলনীতি

১. উৎস বা আকর (Sources)

ইতিহাস পর্যালোচনার প্রথম শর্ত হলো এর উৎস যাচাই করা। যিনি ঘটনাটি বর্ণনা করছেন, তিনি কি সেই সময়ের মানুষ নাকি অনেক পরের? যদি পরবর্তী সময়ের হন, তবে তিনি মূল সময়কাল থেকে কতটা কাছাকাছি সময়ের? তিনি কি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন? এছাড়া এই তথ্যের ভিত্তি কী – এটা কি কোনো সরকারি নথি, প্রাচীন শিলালিপি, মুদ্রা, চিঠি নাকি সমসাময়িক কোনো লোকগল্প? এই উৎসগুলোর প্রকৃতির ওপরই তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা নির্ভর করে। যেমন – কয়েকশ বছর আগের কোনো শিলালিপির বরাত দিয়ে প্রাপ্ত তথ্য অত্যন্ত শক্তিশালী প্রমাণ হিসেবে গণ্য হয়।

২. বর্ণনাকারী বা ইতিহাসবিদ (Narrator/Historian)

দ্বিতীয় মূলনীতি হলো বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতা ও নিরপেক্ষতা যাচাই করা। একজন মুসলিম যখন নিজের ইতিহাস লিখবেন, তিনি এক ধরনের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লিখতে পারেন। আবার একজন অমুসলিম বা প্রাচ্যবিদ (Orientalist) যখন একই বিষয় লিখবেন, তার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ – 'ক্রুসেড' যুদ্ধের বর্ণনায় মুসলিম ইতিহাসবিদদের ভাষ্য আর খ্রিস্টান বা ইউরোপীয় ইতিহাসবিদদের ভাষ্য এক নয়। তাই বর্ণনাকারীর পরিচয়, উদ্দেশ্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করা আবশ্যক।

৩. তথ্যের অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য (Internal Consistency) ও যৌক্তিকতা

বর্ণনায় কোনো স্ববিরোধিতা, অতিরঞ্জন বা অসম্ভব কোনো দাবি আছে কি না তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। মুসলিম ইতিহাসে অনেক সময় এমন কিছু বিবরণ আসে যেখানে অবাস্তব বা অলৌকিক বিষয়ের অবতারণা করা হয়; যেমন – কোনো ব্যক্তি বাতাসে উড়ছেন কিংবা অতি সামান্য সৈন্য নিয়ে অবান্তর অসাধ্য সাধন করছেন। এসব ক্ষেত্রে ঘটনার প্রেক্ষাপট, স্ববিরোধিতা এবং প্রকৃত তথ্যের সাথে এর যৌক্তিকতা বিচার করা জরুরি। তথ্যের অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্যই এর সত্যতা নিশ্চিত করে।

৪. বাহ্যিক সাক্ষ্য (External Evidence)

আলোচিত বিষয়টি সম্পর্কে অন্য কোনো সমসাময়িক উৎস কী বলছে, তা খতিয়ে দেখা। যেমন – আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সিরাত রচনার ক্ষেত্রে কুরআন মাজিদ এবং অন্যান্য প্রামাণ্য বর্ণনা তো রয়েছেই, তবে সেই সময়কার কবিতাগুলোও বড় বাহ্যিক সাক্ষ্য হতে পারে। তৎকালীন আরব কবিতায় অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। কোনো ঐতিহাসিক তথ্যকে সংশোধন বা সত্যতা যাচাইয়ের জন্য এই বাহ্যিক সাক্ষ্যের ভূমিকা অপরিসীম।

৫. স্থান ও কালের প্রাসঙ্গিকতা

বর্ণিত ঘটনাটি ওই সময়ের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ভৌগোলিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না, তা যাচাই করা। উদাহরণস্বরূপ – কেউ যদি দাবি করে, একটি বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা যখন ঘটেছিল তখন ওই অঞ্চলে প্রচণ্ড শীত ছিল, অথচ ভৌগোলিক তথ্য অনুযায়ী সেই নির্দিষ্ট মাসে সেখানে শীত থাকার কোনো সুযোগই নেই; তবে পুরো বর্ণনাটিই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়বে।

৬. মূল পাঠ ও পরবর্তী ব্যাখ্যার পার্থক্য

অনেক সময় মূল ঘটনার সাথে পরবর্তী সময়ে নানা রকম ব্যক্তিসাপেক্ষ ব্যাখ্যা ও বিবরণ যুক্ত হয়।

যেমন – 'শাক্কুল কামার' বা চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার ঘটনা। এক বর্ণনাকারী মূল ঘটনাটি একভাবে বলছেন, আরেকজন তার নিজস্ব অনুভূতির মিশেলে অন্যভাবে বলছেন (যেমন – হাতের ইশারায় চাঁদ দুভাগ হয়ে দুই দিকে চলে গেল)।ইতিহাস পাঠের সময় মূল ঐতিহাসিক সত্য এবং পরবর্তীতে যুক্ত হওয়া বর্ণনামূলক ব্যাখ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে জানা জরুরি।

৭. ধ্রুব সত্য ও ধারণাপ্রসূত ইতিহাসের পার্থক্য
যে বিষয়টা নিশ্চিত ও প্রমাণিত, তা নিয়ে কোনো বিতর্ক থাকে না (যেমন – বাংলাদেশের অভ্যুদয়)।কিন্তু এই ঘটনার প্রেক্ষাপট নিয়ে একেক জনের একেক রকম বিশ্লেষণ বা ধারণাপ্রসূত ব্যাখ্যা থাকতে পারে। যেমন – পাকিস্তানি পাঠ্যপুস্তকে দাবি করা হয় যে, তৎকালীন হিন্দু শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের মনে এক ধরনের বিশেষ চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন অথবা রাজনৈতিক নেতৃত্ব সম্পর্কে ভিন্ন মূল্যায়ন করা হয় – এগুলো একেকটি দৃষ্টিভঙ্গি বা ধারণা।এই ব্যাখ্যাগুলোর সত্যতা বিশ্লেষণ করে প্রকৃত সত্যে পৌঁছানো এবং বিভ্রান্তি এড়ানোই ইতিহাস পাঠের মূল লক্ষ্য।

এই সাতটি মূলনীতি মূলত ইতিহাস পাঠ এবং ইতিহাস থেকে সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান গাইডলাইন বা পাথেয় হিসেবে কাজ করে।

মোহাম্মদ সিয়াম: ইসলামি ইতিহাস অধ্যয়নের মৌলিক নীতিসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য ধন্যবাদ। আমার পরবর্তী প্রশ্ন হলো – শিয়াদের ইতিহাসের আকর গ্রন্থগুলো কি আলাদা? অর্থাৎ পূর্বে আপনি ইতিহাসের যে সকল আকর গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছিলেন, সেগুলোর মধ্যেই কি শিয়াদের ইতিহাসও অন্তর্ভুক্ত, নাকি তাদের জন্য পৃথক কোনো আকর গ্রন্থ রয়েছে? সংক্ষেপে, শিয়া এবং সুন্নি – উভয় পক্ষের জন্যই ইতিহাসের প্রাথমিক আকর গ্রন্থগুলো অভিন্ন কি না, তা পরিষ্কার করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

শিয়া ইতিহাস ও দৃষ্টিভঙ্গি

জনাব নাইম বালুচ: শিয়া সম্প্রদায় ইতিহাসের বর্ণনার ক্ষেত্রে একটি বড় বৈসাদৃশ্য বজায় রেখে চলে।তারা কেবল আহলে বাইত এবং যারা হযরত আলি (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি সহমর্মী ও তার অনুসারী ছিলেন, তাদের বর্ণনাগুলোকেই নির্ভরযোগ্য মনে করে এবং কেবল তাদের থেকেই বর্ণনা গ্রহণ করেন।

আহলে বাইত ছাড়া অন্যান্য পক্ষ, বিশেষ করে হযরত ওসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও হযরত আমির মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) – যাদেরকে 'শিয়ানে মুয়াবিয়া' বলা হয় – তাদের কোনো বর্ণনা আসলে শিয়াপন্থীরা তা প্রত্যাখ্যান করে।ইতিহাস গ্রহণের ক্ষেত্রে এটাই তাদের প্রধান অন্তরায়।এ কারণেই তারা ইবনে হিশাম বা ইবনে ইসহাকের মতো প্রাচীন ও বিখ্যাত ঐতিহাসিকদের পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান না করলেও এবং তাদের ইতিহাসের উৎস হিসেবে গণ্য করলেও, সেখান থেকে কেবল সেই অংশগুলোই গ্রহণ করে, যা তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সুন্নিদের ক্ষেত্রেও এমনটি দেখা যায়।যেসব ঐতিহাসিকের বর্ণনায় শিয়াপন্থী মনোভাব বা প্রভাব পাওয়া যায়, সুন্নি স্কলাররা তাদের কঠোর সমালোচনা করেন; যেমন – ওয়াকিদির বর্ণনা বা ইয়াকুবির ইতিহাস। এমনকি ইমাম তাবারি এবং বালাজুরির কোনো কোনো বর্ণনার ক্ষেত্রেও এই ভিন্নমত ও সমালোচনা দেখা যায়। সুতরাং ঐতিহাসিক ও বর্ণনা গ্রহণের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মধ্যেই এই পার্থক্য বিদ্যমান।

শিয়াদের মৌলিক গ্রন্থসমূহ

শিয়াদের প্রধান ও মৌলিক ৪টি হাদিস ও ইতিহাসভিত্তিক কিতাবকে 'কুতুবুল আরবা' বলা হয়।সেগুলো হলো:

- শেখ কুলাইনির ‘আল-কাফি’
- শেখ সুদুকের ‘মান লা ইয়াহদুরুহুল ফকিহ’
- শেখ তুসির ‘তাহজিবুল আহকাম’
- শেখ তুসির ‘আল-ইস্তিবসার’

তবে শিয়ারা এই কিতাবগুলোর সব বিষয়কে অন্ধভাবে মেনে নেয় না; সেখানেও তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যা ও মতপার্থক্য রয়েছে। এছাড়া তাদের অন্যান্য মৌলিক ও প্রসিদ্ধ কিতাবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- শেখ মুফিদের ‘আল-ইরশাদ’
- তাবারসির ‘ইলামুল ওয়ারা’
- আল্লামা মাজলিসির ‘বিহারুল আনোয়ার’
- মুনতাহাউল আমাল

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য

শিয়া ও সুন্নিদের ইতিহাস চর্চার মূল পার্থক্যটি সংক্ষেপে মূল্যায়ন করলে দেখা যায় – শিয়ারা শুরু থেকেই মনে করেন, হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু), হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং হযরত ওসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) খিলাফত জবরদখল করেছিলেন এবং অন্য সাহাবিরা হযরত আলি (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর পক্ষ না নিয়ে তাদের সমর্থন দিয়েছিলেন। এখান থেকেই এক কেন্দ্রীয় ও বড় রাজনৈতিক-ধর্মীয় মতভেদের সৃষ্টি হয়।

শিয়ারা ইতিহাসকে তাদের ইমামত ও ইমামিয়া আকিদার আলোকে দেখে। তাদের মতে ইমামরা আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত এবং মাসুম বা নিষ্পাপ। অথচ সুন্নিরা হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছাড়া আর কাউকে মাসুম মনে করেন না। ফলে শিয়া ও সুন্নিদের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রায় ১৮০ ডিগ্রি পার্থক্য রয়েছে, যা ইতিহাস পর্যালোচনার সময় সর্বদা বিবেচনায় রাখতে হবে।

মোহাম্মদ সিয়াম: আহলে তাশাইয়ু ও আহলে সুন্নাতের মধ্যকার মৌলিক পার্থক্য এবং তাদের কিতাবসমূহ সম্পর্কে চমৎকার ধারণা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। ইতিহাস সংক্রান্ত পরবর্তী প্রশ্নে যাওয়ার আগে হাদিস নিয়ে একটি বিষয় জানতে চাই।সুন্নিদের যে হাদিসগ্রন্থগুলো রয়েছে – তা সিহাহ সিত্তা হোক কিংবা অন্য কোনো কিতাব – মুসলিম ইতিহাসে সেগুলোর ভূমিকা কী? ধর্মতাত্ত্বিক বা আকিদাগত বিতর্ক ব্যতিরেকে, কেবল ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাসে হাদিসের ভূমিকা বা অবদান সম্পর্কে জানতে আগ্রহী।

হাদিস বনাম সাধারণ ইতিহাস সংকলন

জনাব নাইম বালুচ: হাদিস গ্রহণের মানদণ্ড অত্যন্ত শক্তিশালী, সূক্ষ্ম এবং বেশ কঠিন। বর্ণনাকারীর কাছ থেকে যখন কোনো হাদিস গ্রহণ করা হয়, তখন তা অত্যন্ত কঠোর যাচাই-বাছাইয়ের মধ্য দিয়ে যায়। সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থের মানদণ্ড হাদিসের এই কঠোরতার তুলনায় অনেকটাই শিথিল।

- বর্ণনাকারীর যোগ্যতা ও আদালত: হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীর স্মৃতিশক্তি কেমন তা গভীরভাবে পরীক্ষা করা হয়। যে বর্ণনাকারীর সূত্র ধরে তিনি হাদিসটি বর্ণনা করছেন, তার সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ হওয়া আদৌ সম্ভব ছিল কি না – তা ঐতিহাসিকভাবে নিশ্চিত করা হয়।এছাড়া তার বোধশক্তি, চরিত্র ও সামাজিক খ্যাতি – যাকে বর্ণনাকারীর 'আদালত' বলা হয় – সবকিছু কঠোরভাবে বিচার করে তবেই হাদিস গ্রহণ করা হয়।
- ইতিহাসের শিথিলতা: সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থে কোনো একটি বিষয় বর্ণনা করা হলে ঐতিহাসিক যদি তা যৌক্তিক বা পরিস্থিতি অনুযায়ী সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করেন, তবেই তা কিতাবে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। কিন্তু হাদিসের ক্ষেত্রে সনদের ধারাবাহিকতা ও বর্ণনাকারীর সততা ছাড়া কোনো বিবরণ গৃহীত হয় না।

যেসব নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর কাছ থেকে মুহাদ্দিসগণ হাদিস গ্রহণ করেছেন, তাদের সূত্র থেকে যদি কোনো ঐতিহাসিক বিবরণও পাওয়া যায়, তবে তা ইতিহাসে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য বলে গণ্য করা হয়। মুহাদ্দিসগণ বর্ণনাকারীদের জীবনবৃত্তান্ত ও সত্যবাদিতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে যে কঠোর পরিশ্রম ও সতর্কতা অবলম্বন করেছেন, বিশ্বে তার কোনো দ্বিতীয় নজির নেই।

ইমাম বুখারির কিতাবকে যে পৃথিবীর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও যাচাইকৃত গ্রন্থ বলা হয়, তা বর্ণনাকারীদের সূক্ষ্ম বিচার ও অনন্য মানদণ্ডের কারণেই সম্ভব হয়েছে।ইতিহাস ও হাদিস গ্রন্থের সংকলন প্রক্রিয়ার মধ্যে এটাই হলো সবচেয়ে মৌলিক পার্থক্য।

মোহাম্মদ সিয়াম: আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি ইতিপূর্বে মৌলিক গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করে একটি চমৎকার তালিকা প্রদান করেছেন এবং ইবনে খালদুনের অবদান প্রসঙ্গে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ইতিহাসে ইবনে খালদুনের প্রকৃত অবদান এবং ইসলামি ইতিহাসে তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'মুকাদ্দিমা'-র গুরুত্ব ও মর্যাদা কতটুকু, সে সম্পর্কে জানতে চাই।

এর পাশাপাশি আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন – ইবনে খালদুনের পর ইসলামি ইতিহাসে কি নতুন কোনো 'নজরিয়া' বা দৃষ্টিভঙ্গি ও তত্ত্ব সামনে এসেছে, নাকি ইবনে খালদুনই শেষ ব্যক্তিত্ব, যিনি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির অবতারণা করেছেন এবং তার পরে আর নতুন কোনো তত্ত্ব আসেনি? এ বিষয়ে অনুগ্রহ করে দিকনির্দেশনা দিন।

জনাব নাইম বালুচ: আপনার এই প্রশ্নের কয়েকটি অংশ রয়েছে।আমি প্রথম অংশটির উত্তর দিচ্ছি – অর্থাৎ ইবনে খালদুনের 'মুকাদ্দিমা' কেন এত বিখ্যাত এবং ইতিহাসে এর গুরুত্ব কতটুকু। মূলত 'মুকাদ্দিমা' তার একটি বিশাল ঐতিহাসিক গ্রন্থের ভূমিকা মাত্র, যা পরবর্তীতে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণে স্বতন্ত্রভাবে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা লাভ করে।

ইতিহাস চর্চায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন

ইবনে খালদুনের পূর্বে ইতিহাস চর্চার ধারাটি ছিল মূলত বাদশাহদের যুদ্ধবিগ্রহ, বংশলতিকা এবং বিভিন্ন ঘটনার একটি ধারাবাহিক তালিকা মাত্র। কিন্তু জাতিসমূহের উত্থান কেন ঘটে, তাদের চরম উৎকর্ষ বা 'উরুজ' কীভাবে হয়, বিশাল বিশাল সালতানাত কীভাবে গড়ে ওঠে এবং পরবর্তীতে কোন কারণে তা বিলুপ্ত বা পতনশীল হয় – সে বিষয়ে পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকগণ পদ্ধতিগত আলোচনা করেননি। সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, ভূগোল এবং নৈতিকতা – এই উপাদানগুলোর নিজস্ব ইতিহাস কী এবং এগুলো সামগ্রিক ইতিহাসের গতিপথের ওপর কীভাবে প্রভাব ফেলে, তা ইবনে খালদুনই প্রথম আবিষ্কার করেন।

এই যুগান্তকারী অবদানের কারণে তাকে 'ইতিহাসের দর্শন' (Philosophy of History), 'সমাজবিজ্ঞান' (Sociology) এবং 'সাংস্কৃতিক গবেষণার' (Cultural Studies) অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ মনে করা হয়। প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে তিনি প্রথমবারের মতো দেখিয়েছেন যে, কোনো সমাজ বা জাতিকে বুঝতে হলে এই সমস্ত বিষয়ের আন্তঃসম্পর্ক জানা অপরিহার্য।

ইতিহাস পাঠ ও যাচাইয়ের বৈজ্ঞানিক মূলনীতি

ইবনে খালদুন ইতিহাসের 'তানকিদ' বা সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের ওপর সর্বোচ্চ জোর দিয়েছেন। তার মতে, কোনো বর্ণনা পাওয়ামাত্রই তা সরাসরি গ্রহণ করা যাবে না, বরং তা কঠোরভাবে যাচাই-বাছাই করতে হবে। সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য এবং অতিরঞ্জনকে আলাদা করার জন্য তিনি 'মুকাদ্দিমা'-য় কতগুলো মৌলিক নীতি দিয়েছেন:

- যুক্তি ও বাস্তব সম্ভাবনা: যেকোনো ঐতিহাসিক বর্ণনা বা ঐতিহ্যকে যুক্তি এবং বাস্তব সম্ভাবনার ভিত্তিতে যাচাই করতে হবে। দেখতে হবে সেটা মানব স্বভাব, সামাজিক নিয়ম এবং ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না।উদাহরণস্বরূপ – কোনো ঐতিহাসিক যদি দাবি করেন, অমুক প্রাচীন শহরে কয়েক লক্ষ সৈন্য আক্রমণ করেছিল, তবে সমাজতাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে খতিয়ে দেখতে হবে সেই শহরের আয়তন, জনসংখ্যা ও রসদ কি আদৌ এত বড় একটি বাহিনীর ভার বহন করার সক্ষমতা রাখত?
- 'মতন' বা মূল বক্তব্যের যৌক্তিকতা: মুহাদ্দিসগণ তথা হাদিস বিশারদগণ সাধারণত 'সনদ' বা বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতার ওপর বেশি জোর দেন। বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী হলে সনদের ধারাবাহিকতায় বর্ণনাটি গৃহীত হয়। কিন্তু ইবনে খালদুন জোর দিয়েছেন 'মতন' বা মূল বক্তব্যের যৌক্তিকতার ওপর। তিনি শিখিয়েছেন – শুধু 'কে' বলছেন তা দেখলে হবে না, 'কী' বলছেন সেটা বাস্তবতার নিরিক্ষে যৌক্তিক কি না তাও খতিয়ে দেখতে হবে।
- পক্ষপাতদুষ্টতা চিহ্নিতকরণ:পক্ষপাত কেবল ধর্মীয় বা মতাদর্শিক (যেমন শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্ব) হয় না; এটা গোত্রীয়, রাজনৈতিক বা জাতীয়ও হতে পারে। একজন ঐতিহাসিকের উদ্দেশ্য কী এবং তিনি কেন এই ইতিহাস লিখছেন – তা জানা জরুরি।যেমন, কেউ যদি কোনো বাদশাহর কর্মচারী বা রাজঅনুগ্রহপ্রাপ্ত হন, তবে তার বর্ণনায় সেই শাসকের ত্রুটিগুলো স্বাভাবিকভাবেই ঢাকা পড়ে যাওয়ার শঙ্কা থাকে।
- অতিরঞ্জন বর্জন: এটা ইতিহাসের মিথ্যাচারের সবচেয়ে বড় উৎস। মানুষ কেবল চিত্তবিনোদনের জন্য বা গল্পকে আকর্ষণীয় করতে ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে অদ্ভুত সব অতিরঞ্জিত বিবরণ যোগ করে দেয়। ইবনে খালদুন এই অতিরঞ্জন থেকে ইতিহাসকে মুক্ত করার তাগিদ দিয়েছেন, কারণ প্রতিটি ঐতিহাসিক ঘটনাই কোনো না কোনো সামাজিক পরিবেশ ও প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে ঘটে থাকে।

আসাবিয়া এবং সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের জীবনচক্র

একটি জাতির আসাবিয়া (সামাজিক সংহতি বা গোত্রীয় ঐক্য), অর্থনীতি, ধর্ম, ভূগোল, পেশা এবং শহুরে বা গ্রামীণ জীবন – এসবের ওপর ভিত্তি করে ইবনে খালদুন তার 'মুকাদ্দিমা' গ্রন্থে আলাদা আলাদা অধ্যায় রচনা করেছেন। তিনি প্রতিটি বিষয়কে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতনের একটি সুনির্দিষ্ট জীবনচক্র বা সামাজিক আইন তুলে ধরেছেন।

- ১. উত্থান পর্ব: আদিম বা গ্রামীণ অবস্থায় একটি গোত্রের মধ্যে তীব্র 'আসাবিয়া' বা সামাজিক সংহতি থাকে। এই ঐক্যের শক্তিতে তারা কোনো দুর্বল বা বিলাসপ্রিয় সাম্রাজ্যকে আঘাত করে নিজেদের শাসন কায়েম করে এবং উন্নতির শিখরে পৌঁছায়।
- ২. বিকাশ ও স্থবিরতা: শাসন ক্ষমতা স্থায়ী হওয়ার পর তাদের মধ্যে বিলাসিতা, প্রচুর ধন-সম্পদ ও নাগরিক সভ্যতার আগমন ঘটে।শাসকেরা তখন আরাম-আয়েশে মগ্ন হয়ে পড়েন।
- ৩. পতন পর্ব: প্রজাদের দমনের জন্য এবং বিলাসিতার খরচ মেটাতে শাসকেরা তখন জুলুম ও অতিরিক্ত করের আশ্রয় নেন, ফলে সামগ্রিক মানুষের চরিত্রের দৃঢ়তা ও নৈতিকতা কমে যায়। একপর্যায়ে শাসকরা যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার চেয়ে প্রাসাদে থাকাকেই বেশি পছন্দ করেন।এই চরম দুর্বলতার সুযোগে অন্য কোনো সংহতিপূর্ণ উদীয়মান শক্তি (নতুন আসাবিয়া) তাদের ওপর আক্রমণ করে এবং তাদের পরাজিত করে ক্ষমতা দখল করে নেয়।

সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে অতীত মূল্যায়নের গুরুত্ব

ইবনে খালদুনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হলো – অতীতের কোনো ঘটনাকে বর্তমানের মানদণ্ড বা আধুনিক চশমা দিয়ে বিচার করা ঠিক নয়।প্রতিটি যুগের নিজস্ব প্রয়োজন, সম্পদ, অভ্যাস এবং রাজনৈতিক বাস্তবতা থাকে।আজ আমরা যে সামাজিক বা রাজনৈতিক ব্যবস্থার (যেমন গণতন্ত্র) জয়গান গাইছি, তৎকালীন যুগে ঐতিহাসিক বাস্তবতায় সেটা হয়তো অকার্যকর কিংবা ক্ষতিকরও হতে পারত।

তাই কোনো একজন ঐতিহাসিক চরিত্র বা শাসক কেন একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তা সে সময়ের সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে বুঝতে হবে।

একটি ঐতিহাসিক উদাহরণ:

খিলাফতে রাশিদুনের সময়কালটি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, প্রথম তিনজন খলিফা – হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত ওমর ফারুক এবং হযরত ওসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) – সম্পূর্ণভাবে তাদের মহান চরিত্র, যোগ্যতা ও শুরা পদ্ধতির ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন; সেখানে বংশগত কোনো উত্তরাধিকার কাজ করেনি। কিন্তু হযরত আলি (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর খিলাফত একটি চরম বিশৃঙ্খল ও উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে শুরু হয়।

পরবর্তীতে হযরত আলি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তার পুত্র হযরত হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে এবং পরবর্তীতে হযরত মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তার পুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। তারা দুজনেই খিলাফতে রাশিদুনের সেই প্রচলিত রীতি থেকে বের হয়ে উত্তরাধিকার প্রথার দিকে গিয়েছিলেন।

এখন প্রশ্ন হলো – হযরত আলি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং হযরত মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কি ধর্মীয় বুঝ বা ইসলামের জ্ঞানের অভাবে এমনটি করেছিলেন, নাকি তারা স্রেফ বংশীয় শাসন কায়েম করতে চেয়েছিলেন? সমাজতাত্ত্বিক বাস্তবতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিষয়টি তেমন নয়। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় গোত্রীয় সংহতি ও বংশীয় প্রভাব এত তীব্র রূপ ধারণ করেছিল যে, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য উত্তরাধিকার প্রথাই ছিল একমাত্র কার্যকর উপায়। গোত্রীয় সংহতির এই বাধ্যবাধকতা ছাড়া সাধারণ মানুষ অন্য কোনো সাধারণ শাসককে সহজে মেনে নিচ্ছিল না।

আমরা যদি তৎকালীন সময়ের এই সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট না বুঝি, তবে আমরা এই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে ভুল বুঝব বা তাদের অভিযুক্ত করব।

ইবনে খালদুন ইতিহাসের এই ধারাটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, যা আমাদের তৎকালীন ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে একটি গভীর, বস্তুনিষ্ঠ ও নতুন বোধ প্রদান করে।

ইবনে খালদুনোত্তর যুগের স্থবিরতা ও তার গ্রন্থপঞ্জি

ইবনে খালদুনের সমস্ত ঐতিহাসিক মূলনীতিকে একটি বাক্যে প্রকাশ করলে দাঁড়ায় – ইতিহাসকে কেবল প্রথাগত বর্ণনা হিসেবে নয়; বরং যুক্তি, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল এবং মানুষের সামাজিক অভ্যাসের মানদণ্ডে বিচার করতে হবে।

ইবনে খালদুনের পর ইসলামি ইতিহাসে নতুন কোনো তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বা 'নজরিয়া' সামনে আসেনি। মুসলমানরা তার তৈরি করে দেওয়া ভিত্তির ওপরই সন্তুষ্ট ছিল, তাকে আর এগিয়ে নেয়নি। জ্ঞানতাত্ত্বিক উন্নতি একটি মইয়ের মতো; প্রত্যেক পরবর্তী গবেষক যদি পূর্বসূরিদের গবেষণাকে ভিত্তি করে সামনে না এগোন, তবে জ্ঞানের উচ্চতা বৃদ্ধি পায় না। ইবনে খালদুন যখন আবির্ভূত হন, তখন মুসলমানদের রাজনৈতিক পতন শুরু হয়েছিল। তাতারিদের (মোঙ্গল) আক্রমণ থেকে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করাই তখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে দর্শন, ইতিহাস বা নতুন কোনো জ্ঞানতাত্ত্বিক তত্ত্ব নিয়ে কাজ করার সুযোগ মুসলিম বিশ্বে সংকীর্ণ হয়ে পড়ে।

আল্লামা ইবনে খালদুনের প্রধান গ্রন্থসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো:

- কিতাবুল ইবার: এর পুরো নাম–'আল-ইবার ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদা ওয়াল খবর ফি আইয়ামিল আরব ওয়াল আজম ওয়াল বারবার ওয়ামান আসরাহুম মিন যাউয়িস সুলতানিল আকবর'। এটা বিশ্ব ইতিহাসের এক বিশাল সংকলন। আমাদের আলোচিত বিখ্যাত 'মুকাদ্দিমা' মূলত এই বিশাল গ্রন্থের প্রথম খণ্ড বা ভূমিকা মাত্র, যা পরবর্তীতে স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসেবে জনপ্রিয়তা পায়।
- আত-তারিফ বি ইবনে খালদুন ওয়া রেহলাতুহু গারবান ওয়া শারকান: এটা ইবনে খালদুনের নিজস্ব আত্মজীবনী ও ভ্রমণবৃত্তান্ত।

- লুবাবুল মুহাস্সিল ফি উসুলুদ দিন: এটা মূলত ইমাম ফখরুদ্দিন রাজির ‘আল-মুহাস্সিল’ (ইলমুল কালাম ও আকাইদ সংক্রান্ত গ্রন্থ) গ্রন্থের একটি সারসংক্ষেপ।
- শিফাউস সায়িল লি তাহযিবিল মাসায়িল: এটা তাসাউফ, আধ্যাত্মিকতা এবং আত্মশুদ্ধির ওপর রচিত তার একটি অত্যন্ত চমৎকার ও কৌতূহলোদ্দীপক গ্রন্থ।

মোহাম্মদ সিয়াম: আল্লামা ইবনে খালদুন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য ধন্যবাদ।এবার আমি আল্লামা শিবলি নুমানি সম্পর্কে জানতে চাই।উপমহাদেশে আধুনিক যুগে ইসলামি ইতিহাস নিয়ে যেসব প্রশ্ন উঠেছিল, সেগুলোর উত্তর তিনি কীভাবে দিয়েছেন এবং ইতিহাস শাস্ত্রে তার অবদান কী? এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করবেন কি?

জনাব নাইম বালুচ: আল্লামা শিবলি নুমানি সম্পর্কে আমি এক ঘণ্টারও বেশি সময়ের একটি দীর্ঘ প্রামাণ্যচিত্র (Documentary) তৈরি করেছি, যার চিত্রনাট্য ও নির্মাণ প্রক্রিয়ায় আমি সরাসরি যুক্ত ছিলাম। সেখানে শিবলি নুমানির ইতিহাস রচনার পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে উল্লেখ করছি।

আল্লামা শিবলি নুমানিকে আধুনিক যুগের অন্যতম প্রধান মুসলিম স্কলার বা পণ্ডিত বললে ভুল হবে না। তিনি তার সময়ের প্রচলিত ধারা থেকে বেরিয়ে এসে মুসলমানদের মধ্যকার গোষ্ঠীগত বিভেদ দূর করার পথ দেখিয়েছিলেন। একদিকে দেওবন্দি ধারা, অন্যদিকে আহলে হাদিস এবং ফিকহে হানাফি ধারা – তিনি নিজে ইমাম আবু হানিফার আদর্শের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও এই সমস্ত সংকীর্ণ গণ্ডি বা স্কুল অব থটস থেকে উপরে উঠেছিলেন।তিনি নিজেকে পুরো মুসলিম উম্মাহর এক বিশ্বজনীন পণ্ডিত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

শিবলি নুমানির ইতিহাস রচনার প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য

আল্লামা শিবলি নুমানির ইতিহাস রচনার মূল ভিত্তি ছিল তৎকালীন ব্রিটিশ শাসন এবং প্রাচ্যবিদদের (Orientalists) ইসলাম সম্পর্কে ছড়ানো বিভ্রান্তি দূর করা। প্রাচ্যবিদরা ইসলামের বিরুদ্ধে যেসব ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করেছিল, তা রাজনৈতিকভাবে পরাজিত ও অসহায় মুসলমানদের মধ্যে তীব্র হীনম্মন্যতা তৈরি করে। অনেক মুসলমান তখন মনে করতে শুরু করেছিলেন যে, হয়তো তাদের ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক আদেশেই কোনো ত্রুটি রয়েছে।আল্লামা শিবলি নুমানি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই হীনম্মন্যতা থেকে উত্তরণের জন্য একটি যুক্তিনির্ভর, বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ ইতিহাসের প্রয়োজন।

তিনি অত্যন্ত মর্যাদা ও বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে প্রাচ্যবিদ এবং আধুনিক শিক্ষিত সমাজকে উদ্দেশ্য করে নিজের গবেষণাধারার বিকাশ ঘটান। তিনি ইবনে খালদুনের চিন্তাধারা ও সমাজতাত্ত্বিক মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে ইতিহাসকে উপস্থাপন করেছিলেন, যা মুসলিম উম্মাহর জন্য এক অনন্য মাইলফলক।

আল্লামা শিবলি নুমানির উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ:

- সিরাতুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): স্যার সাইয়্যিদ আহমদ খানের একটি বড় স্বপ্ন ছিল প্রাচ্যবিদদের লেখা ইসলামবিদ্বেষী বইগুলোর উপযুক্ত জবাব তৈরি করা। প্রাচ্যবিদদের অবান্তর ও ভিত্তিহীন দাবির বুদ্ধিবৃত্তিক জবাব হিসেবে আল্লামা শিবলি নুমানি এই সিরাত গ্রন্থটি রচনা করেন।এর প্রথম খণ্ডে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনী স্থান পায়।পরবর্তী খণ্ডগুলো – যা সিরাতের ভিন্ন ভিন্ন তাত্ত্বিক দিকের ওপর ভিত্তি করে পরিকল্পিত ছিল – তা তার যোগ্য ছাত্র সাইয়্যিদ সুলাইমান নদভি সম্পন্ন করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকাটি সিরাত গবেষণার এক অনন্য সারসংক্ষেপ।
- আল ফারুক: এটা হযরত ওমর ফারুক (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সিরাত, খিলাফত, রাষ্ট্র পরিচালনা, প্রশাসনিক সংস্কার ও বিজয়ের ওপর লেখা একটি কালজয়ী গ্রন্থ।

- আল মামুন: এটা আব্বাসীয় খলিফা মামুনুর রশিদের শাসনামল, তৎকালীন জ্ঞানবিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চাকে কেন্দ্র করে এই ইতিহাস গ্রন্থটি রচিত।
- সিরাতুন নুমান ও আল গাজালি: 'সিরাতুন নুমান' গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফা এবং 'আল গাজালি' গ্রন্থে ইমাম গাজালির জীবন ও দর্শন আলোচিত হয়েছে।
- ইলমুল কালাম ও মাকালাত (প্রবন্ধ সমগ্র): এই বই এবং প্রবন্ধগুলোতে কেবল সাধারণ ইতিহাসই নয়, বরং ইসলামি আকিদা, বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্ক এবং মুসলমানদের ইলমি ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের নানা দিক নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে।

আধুনিক বিজ্ঞানের মুখোমুখি শিবলি নুমানি

ডারউইনের বিবর্তনের তত্ত্ব (Theory of Evolution) যখন সামনে আসে, তখন অনেক মুসলিম স্কলার দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন।আল্লামা শিবলি নুমানি তখন ডারউইনের তত্ত্ব নিয়ে তার নিজস্ব দার্শনিক মতামত পেশ করেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, বৈজ্ঞানিক বিবর্তন একটি অনিবার্য প্রক্রিয়া এবং এটা মৌলিক ইসলামি বা ধর্মীয় শিক্ষার পরিপন্থী নয়।

'মুজাদ্দেদ' বনাম 'মুতাযাদিদ': স্যার সাইয়্যিদ ও শিবলি নুমানি

আল্লামা শিবলি নুমানি দীর্ঘদিন আলিগড়ে স্যার সাইয়্যিদ আহমদ খানের সান্নিধ্যে গবেষক হিসেবে কাজ করেছিলেন। তবে একপর্যায়ে তিনি অনুভব করেন যে, স্যার সৈয়দের চিন্তাধারা ইসলামের মৌলিক দর্শন থেকে বিচ্যুত হচ্ছে এবং তিনি অপ্রয়োজনীয়ভাবে ইসলামকে আধুনিক পশ্চিমা যুগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার চেষ্টা করছেন।শিবলির দৃষ্টিতে, স্যার সাইয়্যিদ 'মুজাদ্দেদ' (সংস্কারক) হওয়ার পরিবর্তে 'মুতাযাদিদ' (বিরোধী বা বিতর্কিত ধারার প্রবক্তা) হয়ে উঠছিলেন।

- মুতাযাদিদ: এমন ব্যক্তি, যিনি নিজের মনগড়া আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠার জন্য ইতিহাসের তথ্য বা ব্যাখ্যাকে পরিবর্তন করেন।
- মুজাদ্দেদ: যিনি সমসাময়িক পরিস্থিতি ও যুগের নিরিখে ইসলামের চিরন্তন সত্যগুলোকে নতুন আঙ্গিকে ও যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করে মানুষের সংশয় দূর করেন।

আল্লামা শিবলি ছিলেন প্রকৃত অর্থে একজন 'মুজাদ্দেদ'। তার একটি বিখ্যাত বক্তব্য হলো:

"আমি ইসলামকে আজকের যুগের গোলকধাঁধা থেকে বের করে সেই সাহাবা ও আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগ পর্যন্ত নিয়ে যেতে চাই, যখন ইসলাম তার আদি ও অকৃত্রিম রূপে ছিল; এবং পরবর্তী সময়ে মুসলমানদের মধ্যে যেসব অনৈসলামি চিন্তাধারা ও বিচ্যুতি ঢুকেছে, তা থেকে ধর্মকে পবিত্র রাখতে চাই।'

দাবিস্তানে শিবলি (শিবলির চিন্তাধারা) ও তার উত্তরাধিকার

আল্লামা শিবলি নুমানি কোনো সংকীর্ণ ধর্মীয় গণ্ডিতে আটকে না থেকে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জ্ঞান ও ইসলামি বিজ্ঞানকে ধারণ করতে চেয়েছিলেন। তার এই প্রগতিশীল ও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ধারাটিকে 'দাবিস্তানে শিবলি' বলা হয়। তার এই চিন্তাধারার সার্থক উত্তরাধিকারী হলেন ইমাম হামিদুদ্দিন ফারাহি, ইমাম আমিন আহসান ইসলাহি এবং জাভেদ আহমেদ গামিদি। এছাড়া মাওলানা মওদুদি এবং আবুল কালাম আজাদের মতো যুগস্রষ্টা ব্যক্তিত্বদের ওপরও তার গভীর বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাব ছিল।

মোহাম্মদ সিয়াম: আল্লামা শিবলি নুমানি (রহ.)-এর কাজকে তার সুযোগ্য ছাত্র মাওলানা সুলাইমান নদভি যেভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, সে বিষয়ে আমরা জেনেছি। শিবলি নুমানির পর ভারতীয় উপমহাদেশে এই ঐতিহাসিক ধারাকে আর কোন কোন ব্যক্তিত্ব জারি রেখেছেন এবং তাদের মৌলিক কিতাবসমূহ কী কী – সে সম্পর্কে সংক্ষেপে জানতে চাই।

এর পাশাপাশি, শিবলির সমসাময়িক সময়ে উপমহাদেশের বাইরের ইতিহাসের ওপর কি উল্লেখযোগ্য কোনো কাজ হয়েছে? হয়ে থাকলে সেই ধারার মৌলিক ব্যক্তিত্ব ও তাদের আকর গ্রন্থসমূহ সম্পর্কেও সংক্ষেপে আলোকপাত করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

জনাব নাইম বালুচ: আল্লামা শিবলি নুমানির পরবর্তী সময়ে উপমহাদেশে ইতিহাস চর্চাকে যারা এগিয়ে নিয়েছেন, তারা মূলত উর্দু ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই অত্যন্ত মূল্যবান অবদান রেখেছেন। এই ধারার প্রধান প্রধান ইতিহাসবিদ এবং তাদের ঐতিহাসিক কাজের বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো:

শিবলি-উত্তর যুগের বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও তাদের গ্রন্থপঞ্জি

- সাইয়্যিদ সুলাইমান নদভি:আল্লামা শিবলি নুমানির প্রধান ছাত্র হিসেবে তিনি এই সিলসিলায় সবচেয়ে বড় নাম। তিনি শিবলির অসম্পূর্ণ ‘সিরাতুন্নবী’ গ্রন্থটি সফলভাবে সমাপ্ত করেন।তার নিজস্ব মৌলিক কাজের মধ্যে ‘খুতবাতে মাদরাস’ এবং আরব ও হিন্দুস্তানের পারস্পরিক ঐতিহাসিক সম্পর্ক নিয়ে রচিত গ্রন্থসমূহ অন্যতম। এ ছাড়া শিবলি নুমানির জীবনীর ওপর তার লেখা গ্রন্থটি ইতিহাস চর্চায় একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।
- মোহাম্মদ হাবিব: তিনি আলিগড় ঘরানার (Aligarh School of History) অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ঐতিহাসিক। তার গবেষণার মূল বিষয়বস্তু ছিল পবিত্র কুরআন, মধ্যযুগের হিন্দুস্তানি ইতিহাস, দিল্লি সালতানাত, সামাজিক ইতিহাস এবং হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক।
- কে. এ. নিজামি: তিনি মূলত ইংরেজি ভাষায় মধ্যযুগের ইতিহাস নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন।তার বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে:
    i. The Life and Times of Shaikh Nizam-ud-din Auliya
    ii. Some Aspects of Religion and Politics in India During the Thirteenth Century
    iii. History and Historians of Medieval India

সাক্ষাৎকার

- এস. এম. ইকরাম: ইংরেজি ভাষায় তার রচিত ‘History of Muslim Civilization in India and Pakistan’ একটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ আকর গ্রন্থ, যার সংক্ষিপ্ত রূপটি পরবর্তীতে ‘Muslim Civilization in India’ নামে প্রকাশিত হয়।
- তারা চাঁদ: তিনি একজন অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও নিরপেক্ষ ও বড় মাপের ঐতিহাসিক হিসেবে সমাদৃত।তিনি মূলত ইংরেজি ভাষায় ভারতের ইতিহাস নিয়ে কাজ করেছেন।
- ইশতিয়াক আহমেদ কোরেশি:পাকিস্তানের এই প্রথিতযশা ঐতিহাসিকের বিখ্যাত গ্রন্থ হলো ‘The Muslim Community of the Indo-Pakistan Subcontinent’।
- মোহাম্মদ মুজিব: উপমহাদেশীয় মুসলিম সমাজের বিবর্তনের ওপর লেখা তার ‘The Indian Muslims’ বইটি অত্যন্ত বিখ্যাত।
- আজিজ আহমেদ: তিনি উর্দু ও ইংরেজি উভয় ভাষায় দক্ষ হলেও ইংরেজিতে তার কাজের পরিধি ব্যাপক।তার উল্লেখযোগ্য দুটি বই:
    - Studies in Islamic Culture in the Indian Environment
    - An Intellectual History of Islam in India
- ইরফান হাবিব: তিনি একজন মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিক এবং মোগল আমলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের ওপর তার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।তার বিখ্যাত গ্রন্থ হলো ‘The Agrarian System of Mughal India’।
- রমিলা থাপার: প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সুপরিচিত নাম।অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তিনি সম্পূর্ণ ধর্মীয় বিদ্বেষমুক্ত হয়ে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষভাবে ইতিহাস চর্চা করেছেন।
- ড. মোবারক আলি: পাকিস্তানের এই আধুনিক ঐতিহাসিক উর্দু ভাষায় বিপুল কাজ করেছেন।রাষ্ট্র ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বাইরে গিয়ে জনগণের ইতিহাস ধারাকে তিনি জনপ্রিয় করেন।তার রচিত অসংখ্য বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- ‘তারিখ ও আওরাত’ (ইতিহাস ও নারী)
- ‘তারিখ ও সিয়াসত’ (ইতিহাস ও রাজনীতি)
- ‘তারিখ কা নায়া জাবিয়া’ (ইতিহাসের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি)
- ‘আলমিয়া-ই-তারিখ’ (ইতিহাসের বিয়োগান্তক)
- ‘তারিখ কি পৈদাইশ’ (ইতিহাসের জন্ম)

দেশভাগ-উত্তর ইতিহাস চর্চা এবং রাজনৈতিক বা প্রাতিষ্ঠানিক পক্ষপাতিত্ব

উপমহাদেশে শিবলি নুমানির পরবর্তী সময়ে যে প্রাতিষ্ঠানিক বা একাডেমিক ইতিহাস চর্চা হয়েছে, তার সিংহভাগই মূলত ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর বিকশিত হয়েছে। এই পর্যায়টিকে কেন্দ্র করে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক মূল্যায়ন করা আবশ্যক।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ন্যারেটিভ ও ইতিহাস বিকৃতি

দেশভাগের পর পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক প্রয়োজনে (বিশেষ করে মুসলিম লীগের আদর্শিক অবস্থান ধরে রাখতে) ইতিহাসকে একটি নির্দিষ্ট ছক বা কাঠামোর মধ্যে সাজানোর চেষ্টা করা হয়, যা অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাসের ভুল ধারণা তৈরি করেছে। এই প্রক্রিয়ায় খোদ আল্লামা শিবলি নুমানির মতো ব্যক্তিত্বকেও রেহাই দেওয়া হয়নি; তার ব্যক্তিগত জীবন ও সম্পর্কের নানা দিক নিয়ে (যেমন আতিয়া ফয়জির প্রসঙ্গ তুলে) নানা অপবাদ বা বিতর্ক তৈরি করে তার সামগ্রিক অবদানকে খাটো করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই চরম রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পক্ষপাতের বিপরীতে ড. মোবারক আলি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার কাজ করেছেন। তিনি এই সরকারি বিকৃতি ও একপেশে বর্ণনা থেকে মুক্ত থেকে ইতিহাসকে বস্তুনিষ্ঠভাবে উপস্থাপন করেছেন। তবে রাষ্ট্রীয় প্রচারণার প্রতিক্রিয়ায় তৈরি হওয়া আধুনিক উদারপন্থী ঐতিহাসিকদের একাংশের মধ্যেও এক ধরনের সূক্ষ্ম পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করা যায়, যা পদ্ধতিগতভাবে সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়।

ভারতীয় ইতিহাসের সামগ্রিক যুগবিভাগ এবং অধ্যয়নের দৃষ্টিভঙ্গি

উপমহাদেশের সামগ্রিক ইতিহাসকে প্রধানত কয়েকটি ঐতিহাসিক যুগে বিভক্ত করে অধ্যয়ন করা যেতে পারে:

- ১. প্রাক-মুসলিম যুগ (বৈদিক ও আর্য আমল): মুসলমানদের আগমনের পূর্ববর্তী সময়কাল, যেখানে আর্যদের আগমন ও আদি বৈদিক সভ্যতা নিয়ে ঐতিহাসিকভাবে একাধিক ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ ও বিশ্লেষণ বিদ্যমান।
- ২. প্রাচীন বৈদেশিক আক্রমণ ও যোগাযোগের যুগ: মুসলমানদের আগমনের পূর্বে আলেকজান্ডারের আক্রমণসহ গ্রিক এবং ইরানিদের সাথে ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংস্পর্শের ইতিহাস।
- ৩. আরব ও মুসলিম শাসনকাল: সিন্ধু বিজয় ও সুলতানি আমল থেকে শুরু করে মোগল সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত দীর্ঘ মুসলিম শাসনব্যবস্থার যুগ।
- ৪. ব্রিটিশ উপনিবেশকাল: ইংরেজদের আগমন, শাসন এবং এর ফলে সৃষ্ট আধুনিক রাজনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরের ইতিহাস।

ইংরেজদের আগমনের পর উপমহাদেশে ইতিহাস রচনার বৈজ্ঞানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ধারা সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও, তাদের ইতিহাসেও ঔপনিবেশিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট গভীর পক্ষপাত ছিল, যদিও অনেক তথ্যগত সত্যও সেখানে পাওয়া যায়।

পরবর্তীতে ভারত ও পাকিস্তান আলাদা হয়ে যাওয়ার পর, পাকিস্তানের নিজস্ব এক ধরনের রাজনৈতিক পক্ষপাত তৈরি হয়েছে এবং বর্তমান হিন্দুস্তানেরও নিজস্ব রাজনৈতিক ও আদর্শিক পক্ষপাত তৈরি হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, উভয় দেশেই আজ ইতিহাসকে অত্যন্ত বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

ইতিহাসের এই তীব্র মতাদর্শিক ও রাজনৈতিক মেরুকরণের কারণে আমাদের অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। ইতিহাসের কোনো বিবরণ বা কোনো ব্যক্তির বক্তব্যকেই অন্ধভাবে গ্রহণ করা যাবে না; বরং প্রত্যেকটি বিষয়কে অকাট্য দলিল, ধ্রুপদী উৎস এবং পূর্বে আলোচিত ইতিহাস পাঠের ৭টি মৌলিক নীতির (যেমন: উৎসের যাথার্থ্য, যৌক্তিকতা ইত্যাদি) মানদণ্ডে কঠোরভাবে বিচার করতে হবে।

মোহাম্মদ সিয়াম: ভারতবর্ষের বাইরে – অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্য, তুরস্ক, ইরানসহ অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতে আধুনিক যুগে মুসলিম ইতিহাসের ওপর বিশেষ কোনো কাজ হয়েছে কি না? এমন কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিত্ব বা আকর গ্রন্থ কি আছে, যা মুসলিম ইতিহাস চর্চার এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে? এ বিষয়ে আপনার মূল্যায়ন জানতে চাই।

জনাব নাইম বালুচ: প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী উত্তর-ঔপনিবেশিক (post-colonial) যুগে বিশ্বরাজনীতির পাশাপাশি ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। উসমানীয় সাম্রাজ্যের পতন এবং আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রের (Nation-state) উত্থানের পর মুসলিম বিশ্বের ইতিহাস চর্চা মূলত ৪টি প্রধান পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে:

আধুনিক মুসলিম ইতিহাস চর্চার ৪টি প্রধান দিকবদল

- জনমুখী ইতিহাস: ইতিহাস এখন কেবল রাজতন্ত্র, সুলতান বা বাদশাহদের যুদ্ধবিগ্রহের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে সমাজের সাধারণ মানুষের দিকে ধাবিত হয়েছে। আধুনিক ঐতিহাসিকদের কাজের মূল উপজীব্য হলো – সাধারণ মানুষ, নারী, শ্রমিক, কৃষক, সংখ্যালঘু এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সামাজিক অনুষঙ্গ।
- আর্থ-সামাজিক কাঠামোর বিশ্লেষণ: রাজনৈতিক ইতিহাসের পরিবর্তে এখন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা, ভূমি ও কর ব্যবস্থা, সেনাবাহিনী, বাণিজ্য, শিক্ষা, আইন এবং সামগ্রিক অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে পদ্ধতিগত ইতিহাস রচিত হচ্ছে।
- জাতীয়তাবাদের প্রভাব: ইউরোপীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে মুসলিম বিশ্বে 'জাতি-রাষ্ট্র' (Nation-state) ধারণার বিকাশ ঘটে।এর ফলে ইতিহাস চর্চায় ইরানিয়ানা (ইরানি জাতীয়তাবাদ), তুর্কিয়ানা, আরব জাতীয়তাবাদ, ফিলিস্তিনি পরিচয়, বারবার (Berber) পরিচয় এবং আঞ্চলিক মুসলিম পরিচয়ের মতো বিষয়গুলো প্রধান নিয়ামক হিসেবে সামনে এসেছে।

- ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সমালোচনা: উত্তর-ঔপনিবেশিক যুগে পূর্ববর্তী ঔপনিবেশিক শাসনের স্বরূপ, তাদের শোষণ, জুলুম ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনামূলক ঐতিহাসিক সাহিত্য ও পর্যালোচনা রচিত হচ্ছে।

ভৌগোলিক পরিমণ্ডল ও জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রভাব

উপদেশের বাইরে আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক অবদানের ক্ষেত্রে এই ধারার শীর্ষে রয়েছে ইরান। এরপর পর্যায়ক্রমে তুর্কি, মিসরীয় ও সামগ্রিক আরব বিশ্বের স্কলারদের নাম উল্লেখ করা যায়।পাশাপাশি মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, ফিলিস্তিন, সিরিয়া ও লেবাননের প্রেক্ষাপটেও উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে।

আধুনিক একাডেমিক পরিমণ্ডলে মুসলিম ইতিহাস নিয়ে যে কাজগুলো হচ্ছে, তাতে যেমন মার্ক্সবাদ ও ঐতিহাসিক নির্ধারণবাদের (Historical Determinism) প্রভাব রয়েছে, তেমনি দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিকগণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার (Capitalism) আলোকেও মুসলিম সমাজের বিবর্তনকে খতিয়ে দেখছেন।এই আলোচনার ধারাগুলো গতানুগতিক বা প্রথাগত ইসলামি ইতিহাসের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন হলেও মুসলিম ইতিহাসের বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এদের প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী।

মোহাম্মদ সিয়াম: আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে নীতিগত দিকনির্দেশনার জন্য ধন্যবাদ। এবার আমি ফারাহি ঘরানা (Farahi School) সম্পর্কে কিছু জানতে চাই। এই ঘরানায় অনেক বড় বড় মনীষীর জন্ম হয়েছে। ইতিহাস সম্পর্কে ইমাম হামিদুদ্দিন ফারাহি এবং ইমাম আমিন আহসান ইসলাহির দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল?

এর পাশাপাশি আল্লামা খালিদ মাসউদের বিখ্যাত গ্রন্থ 'হায়াতে রাসুলে উম্মি'-র প্রেক্ষাপট, মূল বিষয়বস্তু এবং এতে উঠে আসা নতুন ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

জনাব নাইম বালুচ: প্রথমে মাওলানা হামিদুদ্দিন ফারাহি এবং মাওলানা আমিন আহসান ইসলাহির অবদান প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাক।

ইতিহাস চর্চায় মাওলানা হামিদুদ্দিন ফারাহির অবদান

মাওলানা হামিদুদ্দিন ফারাহির মূল আলোচনার বিষয় ইতিহাস ছিল না; বরং পবিত্র কুরআন এবং কুরআনের ভাষা-শৈলীই ছিল তার প্রধান গবেষণার ক্ষেত্র। তবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো:

- আর-রাইউস সহিহ ফি মান হুয়াজ জাবিহ: আল্লাহর পথে কুরবানি হওয়ার জন্য মনোনীত নবী কে ছিলেন – হযরত ইসমাইল (আলাইহিস সালাম) নাকি হযরত ইসহাক (আলাইহিস সালাম)? এই জটিল ও ঐতিহাসিক বিষয়ের ওপর এটা একটি অত্যন্ত উচ্চমানের মৌলিক গবেষণাগ্রন্থ। মূল আরবিতে লেখা এই কিতাবটির উর্দু অনুবাদ করেছেন মাওলানা আমিন আহসান ইসলাহি। এই গ্রন্থটি বাইবেলীয় ঐতিহ্যের ওপর মাওলানা ফারাহির গভীর পাণ্ডিত্যের অকাট্য প্রমাণ।
- বাইবেল ও আহলে কিতাব সংক্রান্ত গবেষণা: ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ধর্মীয় ঐতিহ্য এবং বাইবেলের ঐতিহাসিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তিনি বেশ কিছু মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তার 'রিসালায়ে নবুওয়াত' ও 'রিসালায়ে রিসালাত' প্রবন্ধ ২টি এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
- নসব নামা: এটা একটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও দুর্লভ পুস্তিকা। এখানে তিনি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বংশ পরিচয় বা নসব নামা সংক্রান্ত প্রচলিত ঐতিহাসিক ধারণাগুলোর চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। বাইবেলের বিবরণ এবং হাদিস শাস্ত্রের তথ্যের তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে তিনি অনেকগুলো নতুন ঐতিহাসিক দিক উন্মোচন করেছেন [যেমন: হযরত ইব্রাহিম অবয়বে হযরত ইসমাইল ও হযরত হাজেরাকে যখন আরবের নির্জন প্রান্তরে রেখে আসেন, তৎকালীন সময়ে ইসমাইল (আলাইহিস সালাম)-এর প্রকৃত বয়স ও পরিস্থিতি কেমন ছিল]। আমি নিজে আমার সিরাত গ্রন্থে মাওলানা ফারাহির এই 'নসব নামা' ও 'মান হুয়াজ জাবিহ' গ্রন্থের গবেষণালব্ধ তথ্য ব্যবহার করেছি।

মাওলানা আমিন আহসান ইসলাহির ভূমিকা

মাওলানা ইসলাহি ইতিহাসের ওপর স্বতন্ত্র কোনো বিশেষ কাজ করেননি।তিনি মূলত মাওলানা ফারাহির বইগুলোর অনুবাদ করেছেন এবং তার বিখ্যাত ‘তাদাব্বুর-ই-কুরআন’ তাফসিরটি লিখেছেন, যার মধ্যে ইতিহাসের বেশ কিছু অনুষঙ্গ প্রাসঙ্গিকভাবেই চলে এসেছে।এই তাফসির রচনার সময় তিনি তার ছাত্রদের, বিশেষ করে খালিদ মাসউদ সাহেবের সাহায্য নিয়েছিলেন এবং কিছু কিছু বিষয়ে জাভেদ আহমেদ গামিদি সাহেবের কাছ থেকেও পরামর্শ নিয়েছেন। তবে সিরাতের ওপর কুরআনিক পদ্ধতিতে কাজের ক্ষেত্রে মাওলানা ইসলাহিই খালিদ মাসউদ সাহেবকে ব্যক্তিগতভাবে পথ দেখান এবং উৎসাহিত করেন।

‘হায়াতে রাসুলে উম্মি’ ও মাওলানা খালিদ মাসউদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি

মাওলানা খালিদ মাসউদ ছিলেন আমার শ্বশুর।এই বইটির পাণ্ডুলিপির কাজ ও প্রুফ সংশোধনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকার কারণে এর মূল থিসিসটি খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

- মূল থিসিস: এই বইটির প্রধান দাবি হলো – সিরাতের প্রধান ও অকাট্য আকর উৎস হলো পবিত্র কুরআন; নিছক রেওয়ায়েত বা প্রচলিত ঐতিহাসিক বর্ণনা নয়।
- কুরআনিক দৃষ্টিভঙ্গি: প্রচলিত রেওয়ায়েত বা বর্ণনায় এমন অনেক অনুষঙ্গ আসতে পারে যা সরাসরি নবুয়ত বা রিসালাতের কার্যাবলির সঙ্গে যুক্ত নয় (যেমন তার তৎকালীন ব্যবসা-বাণিজ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ)। আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ২টি সত্তা ছিল – প্রথমত তিনি একজন মানুষ ছিলেন এবং দ্বিতীয়ত তিনি আল্লাহর প্রেরিত রাসুল ছিলেন। পবিত্র কুরআন রিসালাতের দায়িত্ব বা সিরাত সংশ্লিষ্ট কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা বাদ দেয়নি।মাওলানা খালিদ মাসউদ রিসালতের এই সামগ্রিক বিষয়বস্তু বোঝার জন্য কুরআনকেই প্রধান ঐতিহাসিক ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

সম্পূর্ণ কুরআনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রচিত এটাই প্রথম পূর্ণাঙ্গ সিরাত গ্রন্থ। বর্তমানে আমার নিজের সিরাত গ্রন্থটির কাজও সমাপ্তির পথে। আমার এই কাজটি মাওলানা খালিদ মাসউদের বই থেকে অনুপ্রাণিত হলেও আমি তার গবেষণাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি, যেখানে 'আল-মাওরিদ' এবং গামিদ সেন্টার অব ইসলামিক লার্নিং-এর হাদিস ও সিরাত সংক্রান্ত আধুনিক গবেষণালব্ধ বিভিন্ন তথ্যকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও পরিমার্জন করে যুক্ত করা হয়েছে।

মোহাম্মদ সিয়াম: আল-মাওরিদের বর্তমান ইতিহাস সংক্রান্ত কাজ এবং এই শাস্ত্রে ওস্তাদ জাভেদ আহমেদ গামিদি সাহেবের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি কেমন – সে বিষয়ে জানতে চাই।একই সাথে, আল-মাওরিদ এবং ওস্তাদ জাভেদ আহমেদ গামিদি সাহেবের ইতিহাস সংশ্লিষ্ট প্রধান কাজগুলো সম্পর্কে যদি বিস্তারিত দিকনির্দেশনা দিতেন।

জনাব নাইম বালুচ: জাভেদ আহমেদ গামিদি সাহেব পবিত্র কুরআন, ইসলাম এবং এর সামগ্রিক ইতিহাসের একনিষ্ঠ গবেষক।তিনি 'ইসলামি ইতিহাস' এবং 'মুসলিম ইতিহাস' – উভয় ধারার ওপর গভীর পাণ্ডিত্য রাখেন। তিনি তার বিভিন্ন লেকচারে ইতিহাসের বহু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নিয়ে আলোকপাত করেছেন। সম্প্রতি তিনি হযরত আলি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং হযরত আমির মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মধ্যকার মতপার্থক্য ও সংঘাতের প্রেক্ষাপট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং এই বিষয়ে তার নিজস্ব তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন।

জাভেদ আহমেদ গামিদির প্রধান গ্রন্থসমূহ

জাভেদ আহমেদ গামিদির ইতিহাস, আকিদা ও চিন্তামূলক গবেষণার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা নিচে দেওয়া হলো:

- মিজান: এই গ্রন্থে তিনি ইসলাম সম্পর্কে তার দীর্ঘ গবেষণালব্ধ মূল ভাবধারা ও দর্শন উপস্থাপন করেছেন।তিনি কুরআন ও সুন্নাত থেকে প্রাপ্ত ধর্মের প্রকৃত চেতনাকে আধুনিক পরিমণ্ডলে তুলে ধরেছেন।

- তিনি একজন 'মুজাদ্দিদ' (সংস্কারক) হিসেবে ধর্মকে কোনো ধরনের পরিবর্তন ছাড়াই এর অকৃত্রিম রূপে এখানে বিন্যস্ত করেছেন।
- আল-ইসলাম: এটা মূলত 'মিজান' গ্রন্থের একটি চমৎকার ও সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ।
- বুরহান: বিভিন্ন সময়ে তার সম্পাদিত সাময়িকী 'ইশরাক' অথবা অন্যান্য পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে প্রকাশিত গঠনমূলক সমালোচনা ও প্রবন্ধগুলো এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।
- মাকামাত: এই গ্রন্থে ওস্তাদের ইতিহাস বিষয়ক পর্যালোচনা, আত্মজীবনীমূলক আলাপ এবং বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রশ্নের উত্তর সংকলিত হয়েছে।
- খেয়াল ও খামা: এটা তার রচিত একটি উচ্চমানের কাব্যগ্রন্থ।

আল-মাওরিদের বর্তমান তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক প্রকল্পসমূহ

- আপত্তি ও প্রশ্নোত্তর সিরিজ: হাসান ইলিয়াস সাহেবের সঙ্গে জাভেদ আহমেদ গামিদির বহু ঘণ্টার তাত্ত্বিক আলোচনা ও প্রশ্নগুলো এখন গ্রন্থাকারে সংকলিত হচ্ছে। সাইয়্যিদ মনসুরুল হাসান এটা উর্দু ভাষায় সম্পাদনা করছেন এবং ড. ইরফান শেহজাদও এই প্রকল্পে যুক্ত আছেন। মনসুর সাহেব ইতোমধ্যেই 'শাক্কুল কামার' (চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া) এবং কিরাত বা পঠনরীতি সংক্রান্ত ভিন্নমতের ঐতিহাসিক পর্যালোচনার ওপর বইগুলো প্রকাশ করেছেন।
- হাদিস প্রজেক্ট: জাভেদ আহমেদ গামিদির তত্ত্বাবধানে বর্তমানে একটি বৃহৎ হাদিস প্রকল্পের কাজ চলছে, যার প্রথম খণ্ড ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।

ইসলামের জ্ঞানতাত্ত্বিক ইতিহাসে যদি শীর্ষস্থানীয় মনীষীদের তালিকা করা হয়, তবে সাহাবিগণের পরবর্তী সময়ের ইতিহাসে জাভেদ আহমেদ গামিদি সাহেবের নাম অন্যতম প্রধান হিসেবে বিবেচিত হবে।

মোহাম্মদ সিয়াম: ওস্তাদ জাভেদ আহমেদ গামিদি হযরত আলি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং হযরত আমির মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মধ্যকার ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব ও বিতর্কের যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করেছেন, সে বিষয়ে তার নিজস্ব মূল্যায়ন বা অভিমতটি কী? আহলে সুন্নাত বা আহলে তাশাইয়ু (শিয়া)-দের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে কি তিনি ভিন্ন কোনো মত পোষণ করেন?

আলি-মুয়াবিয়া দ্বন্দ্ব: জাভেদ আহমেদ গামিদির বিশ্লেষণ

জনাব নাইম বালুচ: জাভেদ আহমেদ গামিদি সাহেব মূলত আহলে সুন্নাতের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির খুব কাছাকাছি অবস্থান করেন, যা বিশেষভাবে ইবনে তাইমিয়া বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তিনি হযরত আমির মুয়াবিয়ার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে অধিকতর যৌক্তিক মনে করেন।

খিলাফতের পরিস্থিতি: জাভেদ আহমেদ গামিদির মতে, হযরত আলি (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর খিলাফতের সূচনা হয়েছিল একটি চরম বিশৃঙ্খলা ও উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে, যেখানে মুসলিম উম্মাহর সর্বজনীন ঐক্যমত্য (consensus) পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত ছিল না। বিদ্রোহ ছড়ানোর প্রেক্ষাপটে তিনি মূলত পরিস্থিতিগত কারণে বা 'বাই ডিফল্ট' খলিফা মনোনীত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে মানুষ অবশ্য তাকে মেনে নিয়েছিল; কিন্তু যোগ্য ও পরামর্শক ব্যক্তিবর্গের নিয়মতান্ত্রিক পরামর্শের ভিত্তিতে যেভাবে একটি আদর্শ সরকার গঠিত হওয়া উচিত, হযরত আলির প্রশাসন সেভাবে গঠিত হতে পারেনি।তিনি তাকে 'খলিফায়ে রাশেদ' হিসেবে মান্য করলেও তা পরিস্থিতিগত বা 'বাই ডিফল্ট' হিসেবে দেখেন; হযরত আবু বকর, হযরত ওমর ও হযরত ওসমানের স্বাভাবিক খিলাফত প্রাপ্তির মতো করে দেখেন না।অন্যদিকে, তিনি হযরত আমির মুয়াবিয়াকেও খিলাফতে রাশেদার একজন খলিফা হিসেবে গণ্য করেন।

- খিলাফত স্থানান্তরের আইনি শূন্যতা: তার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মত হলো – মুসলিম উম্মাহ নিজেদের মধ্যে খিলাফত বিলুপ্ত করার বা কোনো খলিফাকে অপসারণ করার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা বা নীতিমালা তৈরি করেনি। কুরআন মাজিদে 'শূরা' বা পরামর্শ সভার মূলনীতি থাকলেও তার প্রায়োগিক পদ্ধতি (practical application) কেমন হবে, তার কোনো সুস্পষ্ট সাংবিধানিক বিধান তখনকার ইতিহাসে সুনির্দিষ্ট ছিল না।
- উত্তরাধিকার বা রাজতন্ত্রের সূচনা: হযরত আলি যখন তার পুত্র হযরত হাসানকে এবং হযরত আমির মুয়াবিয়া যখন তার পুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন, তা ছিল মূলত তৎকালীন সমাজ ও গোত্রীয় বাস্তবতার এক নির্মম বাধ্যবাধকতা। কারণ হযরত আলি এবং হযরত আমির মুয়াবিয়ার পর সাহাবিদের মধ্যে এমন কোনো সর্বজনীন ব্যক্তিত্ব ছিলেন না, যাকে মানুষ কোনো বিরোধ ছাড়া খলিফা হিসেবে মেনে নিত। ফলে তৎকালীন বিশ্বের রাজতান্ত্রিক রেওয়াজ ও ক্ষমতার শূন্যতা পূরণের তাগিদে তারা এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন।এ ক্ষেত্রে তিনি হযরত আমির মুয়াবিয়াকে অত্যন্ত মর্যাদার আসনে রাখেন, কারণ আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী উম্মাহকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করার ঐতিহাসিক কৃতিত্ব তার মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছিল।

মোহাম্মদ সিয়াম: এবার আপনার নিজস্ব ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক প্রজেক্ট সম্পর্কে জানতে চাই। বর্তমানে আপনি ইতিহাসের কোন কোন বিষয়ের ওপর কাজ করছেন এবং আপনার প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত বই ও প্রামাণ্যচিত্রগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি কী?

জনাব নাইম বালুচ: আমি নিজেকে ধর্মের একজন শিক্ষানবিস ছাত্র মনে করি। আমার গবেষণার মূল আগ্রহের জায়গা দুটি: প্রথমত মুসলিমদের ইতিহাস (তারিখে মুসলিমিন) এবং দ্বিতীয়ত ফিকশন বা কথাসাহিত্য।

১। ইতিহাস ও জীবনীভিত্তিক প্রকল্প (ডকুমেন্টারি ও সিরাত)

আমি পূর্বেই একটি পূর্ণাঙ্গ সিরাত গ্রন্থ রচনা করেছি। বর্তমানে আমি বিভিন্ন বিশিষ্ট ইসলামি ব্যক্তিত্বের জীবন ও কর্মের ওপর প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের কাজ করছি।

- ইতোমধ্যেই আমি মাওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খান, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ এবং আল্লামা শিবলি নুমানির ওপর প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করেছি।
- বর্তমানে মাওলানা মওদুদির জীবনের ওপর প্রামাণ্যচিত্রের প্রথম খণ্ডের কাজ শেষ করে গ্রাফিক্সের কাজ চলছে; এরপর দ্বিতীয় খণ্ডের কাজ শুরু হবে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হলো – 'দাবিস্তানে শিবলি' বা শিবলির চিন্তাধারার অনুসারী যত বড় স্কলার আছেন, তাদের সবার ওপর প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করা।
- বর্তমানে আমি ডালাসে অবস্থিত GCIL (গামিদি সেন্টার অব ইসলামি লার্নিং)-এর সাথে যুক্ত আছি এবং তাদের প্ল্যাটফর্ম থেকেই এই সমস্ত কাজ পরিচালনা করছি।
- ইমাম আমিন আহসান ইসলাহির জীবনী: ইমাম ইসলাহি তার জীবদ্দশায় আমাকে তার জীবনী লেখার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক গ্রন্থটির কাজ এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং আগামী ২-৩ মাসের মধ্যে এটা প্রকাশিত হবে।

২। ফিকশন, শিশুসাহিত্য ও সিনেমার স্ক্রিপ্ট

- সমাজতাত্ত্বিকভাবে আমি মনে করি, ধর্মকে মানুষের সামনে তুলে ধরার কয়েকটি স্তর রয়েছে।আলেমদের বুদ্ধিবৃত্তিক স্তরের বাইরে সমাজের প্রায় ৮০ শতাংশ সাধারণ মানুষ ধর্ম বা বিভিন্ন ঐতিহাসিক ধারণা মূলত ফিকশন, সিনেমা, টিভি, থিয়েটার কিংবা তথ্য-বিনোদনমূলক (Infotainment) মাধ্যম থেকে গ্রহণ করে। এই জায়গায় কাজ করার উদ্দেশ্যে আমার কিছু বিশেষ প্রকল্প রয়েছে:

- শিশুসাহিত্য: শিশুদের উপযোগী আমার লেখা প্রায় ৩০ থেকে ৪০টি বই বাজারে রয়েছে। লাহোরের 'আল-মাওরিদ'-এ আমার লেখা প্রায় ৩০টি বই জমা আছে, যা আমি নবী-রাসুলদের ইতিহাসের ওপর গল্পচ্ছলে লিখেছিলাম। এই গবেষণার ভিত্তিতেই ইউটিউবে আমার ও আমার ছেলে দানিয়ালের নবীদের ইতিহাস বিষয়ক আলোচনাগুলো প্রচারিত হয়েছে।

- উপন্যাস ও সিনেমার স্ক্রিপ্ট: বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য লেখা আমার দুটি উপন্যাসের কাজ সমাপ্তির পথে। এর মধ্যে একটি উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু হলো 'জিহাদ', যা ৯/১১-এর রাজনৈতিক পটভূমিতে রচিত। এখানে গল্পের ছলে জিহাদের প্রকৃত ইসলামি ধারণা, ৯/১১-এর পর মুসলিমদের সম্পর্কে পশ্চিমা বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি, আধুনিক আমেরিকার সাথে ইরানের দ্বন্দ্ব এবং মুসলমানদের মধ্যকার বিভিন্ন সমসাময়িক ন্যারেটিভের একটি বিশদ তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমানে আমি ডক্টর রেহান আহমেদ ইউসুফি, যিনি মূলত আবু ইয়াহিয়া নামে উর্দু সাহিত্যের জগতে সর্বাধিক পরিচিত, তার লিখা বিখ্যাত উপন্যাস 'জব জিন্দেগি শুরু হোগি' অবলম্বনে নির্মিতব্য সিনেমার স্ক্রিপ্ট লিখছি। এই সিনেমায় অভিনয় করবেন বিশিষ্ট অভিনেতা হামজা আলি আব্বাসি।

ধারাবাহিক বই

বাইবেলে মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসন্ধান

মুশফিক সুলতান

১. ভূমিকা

কুরআন অনুযায়ী, ধর্মীয় সত্যের ভিত্তি দুটি মূল স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে: (১) সহজাত নৈতিক অন্তর্দৃষ্টি তথা ফিতরাত, যার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষ প্রবৃত্তিগতভাবে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে – যুক্তি এবং পর্যবেক্ষণমূলক অভিজ্ঞতার সহায়তায় – এবং (২) ঐশী হেদায়েত, যা এই সহজাত সত্যগুলোর বাহ্যিক সমর্থন, বিস্তার এবং প্রয়োগ হিসেবে কাজ করে। আর এই নবুয়তি সাক্ষ্যের চূড়ান্ত রূপ ও পূর্ণতা হিসেবে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে[1]

[1] এই দ্বৈত জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামো – সহজাত নৈতিক স্বীকৃতি [ফিতরাত] এবং ঐশী হেদায়েতের সমর্থন – কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।প্রথমটি মানুষের সহজাত প্রকৃতি তথা ফিতরাতের সাথে সম্পর্কিত, যা এর ভেতরে কার্যকর যুক্তি ও পর্যবেক্ষণমূলক ক্ষমতার সাথে যুক্ত; আর দ্বিতীয়টি হলো নবুয়তের ইতিহাসের মাধ্যমে প্রমাণিত ঐশী হেদায়েত। কুরআন, ১১:১৭ এই সংশ্লেষণটি তুলে ধরে:
“সুতরাং, যে ব্যক্তি তার রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁর পক্ষ থেকে একজন সাক্ষী তা অনুসরণ করে, আর এর পূর্বে মুসার কিতাব পথপ্রদর্শক ও রহমত হিসেবে বর্তমান – তারা কি এই কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে? [কখনোই না!] এরূপ লোকেরাই এর ওপর ইমান আনে ...”

কুরআন প্রথমোক্ত স্তম্ভটিকে ব্যবহার করে আল্লাহর অস্তিত্ব এবং পরকালের মতো মৌলিক বিষয়গুলোকে প্রতিষ্ঠা করে।আর দ্বিতীয় স্তম্ভটি, অর্থাৎ অতীতের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ এবং তার পরবর্তী বাস্তবায়নের উল্লেখের মাধ্যমে নবুয়তের ঐতিহ্য নিজেই নিজেকে যাচাই করে। এই পদ্ধতিটি নবুয়তের মিশনের ধারাবাহিকতাকে তুলে ধরে, যেখানে পরবর্তী নবীরা তাদের পূর্বসূরিদের ঘোষণাগুলো বাস্তবায়ন করেন।এর মাধ্যমে ঐশী বার্তার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত হয় এবং ইতিহাসের পাতায় একটি অখণ্ড ও ঐক্যবদ্ধ ঐশী ইচ্ছার প্রকাশ ঘটে। ইসলামি বিশ্বাসের একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হলো – কুরআনে যেমনটি বলা হয়েছে – কোনো ভেদাভেদ ছাড়া সব নবীকে মেনে নেওয়া; একজনের প্রত্যাখ্যান মানেই সবার প্রত্যাখ্যান।কুরআন প্রকাশ করে, ইতিহাসের প্রতিটি সম্প্রদায়ের মধ্যে আল্লাহ নবী প্রেরণ করেছেন, যারা তাদেরকে সত্যের পথে পরিচালিত করেছেন। যদিও কুরআন আমাদের এই নবীদের মধ্যে কয়েকজনের নাম জানিয়েছে, তবে এদের অধিকাংশেরই নাম এর ভেতরে উল্লেখ নেই[1] এটা ইঙ্গিত দেয় যে, উৎস বা ঐতিহ্য নির্বিশেষে সত্য যেখানেই পাওয়া যাক না কেন, তাকে স্বীকার করা ও গ্রহণ করার গুরুত্ব অপরিসীম।

এই গবেষণায় বাইবেলের নবী ইশাইয়া (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি আরোপিত একটি ভবিষ্যদ্বাণী এবং ইসলামি ঐতিহ্যের আলোকে নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আগমনের পূর্বাভাস হিসেবে এর ব্যাখ্যা অন্বেষণ করা হয়েছে।এই অনুসন্ধানটি একটি প্রাথমিক প্রবন্ধের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল, যেখানে আমি ইশাইয়া ৪২-এ বর্ণিত চরিত্রের সঙ্গে নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের সাদৃশ্য বিশ্লেষণ করেছিলাম।

[1]"আপনার পূর্বেও আমি অনেক রাসুল পাঠিয়েছি। তাদের মধ্যে এমনও আছে, যাদের কাহিনী আমি আপনার কাছে বর্ণনা করেছি এবং এমনও আছে, যাদের কাহিনী আমি আপনার কাছে বর্ণনা করিনি ..." (কুরআন, ৪০:৭৮)
وَ لَقَدۡ اَرۡسَلۡنَا رُسُلًا مِّنۡ قَبۡلِکَ مِنۡهُمۡ مَّنۡ قَصَصۡنَا عَلَیۡکَ وَ مِنۡهُمۡ مَّنۡ لَّمۡ نَقۡصُصۡ عَلَیۡکَ ...

পরবর্তীতে সমসাময়িক মুসলিম চিন্তাবিদ জাভেদ আহমেদ গামিদি-র কাজের সাথে আমার সম্পৃক্ততা আমাকে সকল ঐশী রাসুলদের মিশনের পিছনে বিদ্যমান একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঐশী নীতি সম্পর্কে আলোকিত করে, যা কুরআনের কাঠামোর মধ্যেই বোঝা যায়। এই নীতিটি, যাকে প্রায়ই কানুনে ইতমামে হুজ্জাত [সত্যেরচূড়ান্ত প্রমাণ উপস্থাপনের নীতি) বা কানুন রিসালাত (বা রিসালাতের বিশেষ আইন) – যা আল্লাহর সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত[1] – বলা হয়, তা মুসলিম বুদ্ধিবৃত্তিক মহলে ক্রমবর্ধমান মনোযোগের বিষয় হয়ে উঠেছে।এই বিষয়টি নিয়ে আগে থেকেই কিছু আলোচনা বা কাজ থাকলেও, এটাকে একটি সুশৃঙ্খল কাঠামো ও পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার মূল কৃতিত্ব মূলত ভারতীয় উপমহাদেশের বিশিষ্ট কুরআন গবেষক ইমাম হামিদুদ্দিন ফারাহি (মৃত্যু ১৯৩০)-এর। এই ধারণাটি তার ছাত্র ইমাম আমিন আহসান ইসলাহি (মৃত্যু ১৯৯৯) আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং পরবর্তীতে তার ছাত্র জাভেদ আহমেদ গামিদি একে আরও পরিশীলিত করেন।ইশাইয়া ৪২-এর ওপর এই ব্যাখ্যামূলক নীতি প্রয়োগ করার মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণীটির একটি নতুন মূল্যায়ন সম্ভব হয়েছে, যা আগে থেকে উপেক্ষিত কাঠামোগত ও ধর্মতাত্ত্বিক মাত্রাগুলোকে উন্মোচিত করেছে এবং আরও সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। এই বইটি এই বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণী ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে পাঠকদের সামনে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার লক্ষ্য নিয়ে রচিত।

মুশফিক সুলতান
সহকারী ফেলো, আল-মাওরিদ

[1] দেখুন পরিশিষ্ট খ: অপরিবর্তনীয় ঐশী রীতি (আল্লাহর সুন্নাত)।

১.১ ইশাইয়া ৪২ এবং মুসলিম ঐতিহ্য

কুরআন নিশ্চিত করে যে, বিদ্যমান ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থগুলোতে নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আগমনের স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে এবং এই ধর্মাবলম্বীদেরকে নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে গ্রহণ ও সমর্থন করার আহ্বান জানানো হয়েছে।কুরআনের অনেক আয়াতে এই দাবির উদাহরণ পাওয়া যায়[1] কুরআন, ৭:১৫৭-এ যেমন দাবি করা হয়েছে যে, নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সমসাময়িক ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় তাদের পবিত্র গ্রন্থগুলোতে তাঁকে খুঁজে পেতেন, এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জন্ম দেয়: নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সমসাময়িকরা কোথায় এমন তথ্য খুঁজে পেয়েছিলেন? বেশ কিছু রেওয়ায়েত রয়েছে, যা এই বিষয়ে কিছু ধারণা দেয়। নিচে প্রাসঙ্গিক কিছু রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হলো:

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তাওরাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিবরণ কেমন? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ।আল্লাহর কসম, তিনি তাওরাতে এমন কিছু গুণাবলিতে বর্ণিত হয়েছেন, যা কুরআনেও তার সম্পর্কে বলা হয়েছে, যেমন: ‘হে নবী! আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে ...’ (কুরআন, ৪৮:৮) এবং নিরক্ষরদের অভিভাবক হিসেবে।আপনি আমার বান্দা এবং আমার রাসুল।আমি আপনার নাম রেখেছি ‘আল-মুতাওয়াক্কিল’ (যে আল্লাহর ওপর নির্ভর করে)।আপনি অসৌজন্যমূলক বা কঠোর নন এবং বাজারে হইচই সৃষ্টিকারীও নন।আপনি মন্দের প্রতি মন্দ দিয়ে প্রতিদান দেন না, বরং ক্ষমা ও দয়া দিয়ে তাদের সাথে আচরণ করেন।

[1]“যারা অনুসরণ করে এই রাসুলের – নবী উম্মির, যাকে তারা তাদের কাছে থাকা তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত পায় ...” (কুরআন, ৭:১৫৭)
اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ ...
[শৈলী ও পরিভাষার জন্য জাভেদ আহমেদ গামিদি এবং শেহজাদ সেলিম অনূদিত ‘দ্য কুরআন ট্রান্সলেটেড’ থেকে কিছুটা পরিমার্জিত]

আল্লাহ তাকে (অর্থাৎ নবীকে) ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দেবেন না, যতক্ষণ না তিনি বক্র মানুষদের সোজা করবেন এই বলানোর মাধ্যমে যে: 'আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই', যার মাধ্যমে অন্ধ চোখ, বধির কান এবং আবৃত হৃদয় খুলে যাবে। [1]

আদ-দারিমি আতা থেকে, তিনি ইবনে সালাম থেকে এবং একইভাবে কাব থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি ছিলেন একজন ইহুদি পণ্ডিত, যিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর ইমান এনেছিলেন:

কাব বলেন: [তাওরাতের] প্রথম লাইনে আছে: মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল, আমার মনোনীত বান্দা। তিনি কঠোর নন, পাষাণ হৃদয়ের নন এবং বাজারে হইচই করেন না। তিনি মন্দের বদলে মন্দ করেন না, বরং ক্ষমা ও উপেক্ষা করেন। তার জন্মস্থান মক্কায়, তার হিজরত তাইবাহতে (অর্থাৎ মদিনা) এবং তার শাসন হবে আশ-শামে (অর্থাৎ বৃহত্তর সিরিয়া)।

এবং দ্বিতীয় লাইনে আছে: মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল। তার অনুসারীদের মধ্যে তারাই অন্তর্ভুক্ত, যারা ক্রমাগত আল্লাহর প্রশংসা করে। তারা সুখ ও দুঃখে আল্লাহর প্রশংসা করে। তারা প্রতিটি স্থানে আল্লাহর প্রশংসা করে এবং প্রতিটি উচ্চ স্থানে তাঁর বড়ত্ব ঘোষণা করে। তারা সূর্যের ওপর ভিত্তি করে নামাজ আদায় করে, যখন নামাজের সময় হয় – এমনকি যদি তারা ময়লার স্তূপের ওপরেও থাকে। তারা তাদের কোমরে কাপড় বাঁধে এবং তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধুয়ে ওজু করে। রাতে আকাশে তাদের কণ্ঠস্বর মৌমাছির গুঞ্জনের মতো শোনা যায়। [2]

[1] বুখারি, সহিহ আল-বুখারি, অনুবাদ: মুহাম্মদ মুহসিন খান (রিয়াদ: দারুস সালাম, ১৯৯৭), খণ্ড ৩, ১৯৪ (রেওয়ায়েত ২১২৫); খণ্ড ৬, ৩১১ (রেওয়ায়েত ৪৮৩৮)।

[2] আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আল-দারিমি। মুসনাদ আল-দারিমি, যা সুনান আদ-দারিমি নামেও পরিচিত। সম্পাদনায়: হুসাইন সেলিম আসাদ আদ-দারানি। প্রথম সংস্করণ। রিয়াদ: দার আল-মুগনি লি-ন-নাশরি ওয়া-ত-তাওজি, ২০০০। ১: রেওয়ায়েত ৬-৭।

এই হাদিসের উল্লেখগুলোতে, বিশেষ করে একজন মনোনীত বান্দার বর্ণনায় – যিনি কঠোর আচরণ করেন না, রাস্তায় উচ্চস্বরে কথা বলেন না এবং বিরোধীদের সাথে ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে আচরণ করেন – আমরা ইশাইয়া ৪২-এর শুরুর আয়াতগুলোর এক বিস্ময়কর প্রতিধ্বনি দেখতে পাই। ইশাইয়ার ভবিষ্যদ্বাণীতে আমরা ঐশীভাবে নিযুক্ত এমন একজন ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ পাই, যাকে 'বান্দা' (প্রায়শই 'প্রভুর বান্দা' হিসেবে অভিহিত) বলা হয়েছে।বলা হয়েছে যে, তিনি বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন এবং তবুও তিনি 'চিৎকার করবেন না বা রাস্তায় নিজের কণ্ঠস্বর উঁচুতে তুলবেন না' (ইশাইয়া ৪২:২)।সুর ও বিষয়বস্তু উভয় ক্ষেত্রেই এই সাদৃশ্যগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী: সেই বান্দাকে তার বিরোধীদের প্রতি মৃদু ও ধৈর্যশীল হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, যাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল মানুষকে সত্যের দিকে পরিচালিত করার। প্রাথমিক যুগের মুসলমানরা, বিশেষ করে আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম[1] এবং কাব আল-আহবার[2]-এর মতো ইহুদি ধর্মান্তরিত ব্যক্তিরা, সম্ভবত এই অভিন্ন গুণাবলিগুলো শনাক্ত করেছিলেন।এটা যুক্তিসঙ্গত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবিরা এই উদ্ধৃতিগুলোর জন্য তারগুমের[3] প্রচলিত আরবি ভাবানুবাদগুলোর সাহায্য নিয়েছিলেন। চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলোর এই সামঞ্জস্য ইঙ্গিত দেয় যে, ইশাইয়া ৪২ সেই প্রাথমিক শাস্ত্রীয় পাঠ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল, যার মাধ্যমে তারা ইহুদি ঐতিহ্যে নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে শনাক্ত করেছিলেন।

[1]আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ইবনে হারিস।ইহুদি রাব্বি যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। পূর্বে হোসেন নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি ইহুদি গোত্র বনু কাইনুকার সদস্য ছিলেন। তিনি ৪৩ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

[2] ইয়েমেনের ইহুদি রাব্বি যিনি আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর খিলাফতের শেষের দিকে অথবা উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর খিলাফতের প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করেন।তিনি ইহুদি কিংবদন্তি তথা ইসরাইলিয়াতের প্রধান বর্ণনাকারী ছিলেন।

[3]তারগুম: আরামীয় ভাষায় হিব্রু বাইবেলের বা এর কোনো অংশের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা। সামনের অনুচ্ছেদ দেখুন।

বেশ কিছু হাদিস বর্ণনায়, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবিরা তুলে ধরেছেন যে, নবীর দয়া ও করুণার ওপর গুরুত্বারোপ, অবিচারের নিন্দা এবং একেশ্বরবাদের প্রতি অবিচল আনুগত্য কীভাবে ইশাইয়াতে বর্ণিত সেই 'বান্দা'-র বাইবেলীয় চিত্রের সাথে মিলে যায়, যাকে বিচার প্রতিষ্ঠা এবং একটি বক্র জাতিকে সংশোধন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। হাদিসের বক্তব্যগুলো কেবল ইশাইয়ার বর্ণিত নৈতিক আচরণের সাথেই মেলে না – তিনি 'একটি জখম হওয়া নল ভাঙবেন না' (ইশাইয়া ৪২:৩) – বরং একেশ্বরবাদী ধর্মগুলোর ঐক্যকারী হিসেবে নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ভূমিকাকেও সুদৃঢ় করে, যা 'দ্বীপপুঞ্জ' বা দূরবর্তী অঞ্চলগুলোর জন্য হেদায়েতের প্রতিশ্রুতি পূরণ করে। প্রাথমিক যুগের মুসলিম গবেষকদের দৃষ্টিতে এই মিলগুলো দেখে অনেকের মনেই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আগমন আসলে এই প্রাচীন হিব্রু ভবিষ্যদ্বাণীরই বাস্তবায়ন।

ইতিহাস জুড়ে মুসলিম পণ্ডিতরাও এই ভবিষ্যদ্বাণীকে নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দিকে নির্দেশিত বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে ইশাইয়া ৪২-এর ভবিষ্যদ্বাণী এবং নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনে এর বাস্তবায়নের ওপর আমার এই বিশ্লেষণ মূলত কুরআনের একটি বিশেষ ধারনার ওপর দাঁড়িয়ে আছে–আর তা হলো আল্লাহর মনোনীত রাসুলদের বিষয়ে আল্লাহর সুনির্দিষ্ট রীতি বা আল্লাহর সুন্নাত[1]। ইশাইয়া ৪২-এর মূল টেক্সট (মূলপাঠ)-এর গভীরে থাকা এই ধারণাটি বুঝতে পারলে, সেখানে বর্ণিত সেই মহামানবের মূল দায়িত্বটি পরিষ্কার হয়ে যায়। এই ভিত্তি থেকেই আমি ইশাইয়া ৪২-এর প্রতিটি আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা তুলে ধরার চেষ্টা করব। আমার এই বিশ্লেষণে কুরআন ও নির্ভরযোগ্য হাদিসের আলোকে নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবন ও মিশনের সাথে এই ভবিষ্যদ্বাণীর যে গভীর মিল রয়েছে, তা তুলে ধরার প্রয়াস পাব।

[1] দেখুন পরিশিষ্ট খ: অপরিবর্তনীয় ঐশী রীতি (আল্লাহর সুন্নাত)।

১.১ টেক্সট (মূলপাঠ) সংক্রান্ত প্রমাণ

এই অংশে আমরা হিব্রু বাইবেলের প্রধান পাণ্ডুলিপিগুলো নিয়ে আলোচনা করব। বিশেষ করে মাসোরেটিক টেক্সট (MT), সেপটুয়াজিন্ট (LXX) এবং তারগুমকে আমরা মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে টেক্সট (মূলপাঠ)-এর সাক্ষ্য বা প্রমাণ যাচাই করব।হিব্রু বাইবেলের বিদ্যমান উৎসগুলো সম্পর্কে 'দ্য কেমব্রিজ কম্প্যানিয়ন টু দ্য হিব্রু বাইবেল/ওল্ড টেস্টামেন্ট'-এ যে তথ্য দেওয়া হয়েছে, তা নিচে তুলে ধরা হলো:

এই অংশে আমরা হিব্রু বাইবেলের মূল পাণ্ডুলিপিগুলো নিয়ে আলোচনা করব। এখানে আমরা মূলত মাসোরেটিক টেক্সট (MT), সেপটুয়াজিন্ট (LXX) এবং তারগুমকে মূল ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করে টেক্সট (মূলপাঠ)-এর সত্যতা যাচাই করব।হিব্রু বাইবেলের এই উৎসগুলো সম্পর্কে The Cambridge Companion to the Hebrew Bible/Old Testaments বইয়ে যা বলা হয়েছে, তা নিচে দেওয়া হলো:

১.১.১ মাসোরেটিক টেক্সট (MT)

"হিব্রু বাইবেলের প্রথাগত বা প্রচলিত টেক্সট (মূলপাঠ)-কে বলা হয় মাসোরেটিক টেক্সট। বাইবেলের মূল টেক্সট (মূলপাঠ) যেন নির্ভুলভাবে সংরক্ষিত থাকে এবং সঠিকভাবে পড়া যায়, সেজন্য 'মাসোরেট' নামে পরিচিত ইহুদি বিশেষজ্ঞরা একসময় এতে বিভিন্ন নির্দেশিকা ও টীকা যুক্ত করেছিলেন। এই টেক্সট (মূলপাঠ) মূলত দুটি অংশে বিভক্ত: একটি হলো ব্যঞ্জনবর্ণের অংশ, যা প্রাচীন পাণ্ডুলিপি থেকে এসেছে; আর অন্যটি হলো স্বরবর্ণ, উচ্চারণ চিহ্ন, সুর করার চিহ্ন ও অন্যান্য নোট, যা পরবর্তীকালে বিশেষজ্ঞরা যুক্ত করেছেন। এমটি (MT)-এর প্রাচীনতম অনুলিপি বা এর অংশগুলো নবম ও দশম শতাব্দীর দিকে পাওয়া যায়।

এর উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, নবীদের কায়রো কোডেক্স ৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে, আলেপ্পো কোডেক্স (যা বর্তমানে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত) ৯২৫ খ্রিস্টাব্দে এবং লেনিনগ্রাদ কোডেক্স (সম্পূর্ণ বাইবেল) ১০০৯ খ্রিস্টাব্দে অনুলিপি করা হয়েছিল।"

"মধ্যযুগ থেকে এটাই সারা বিশ্বের ইহুদিদের প্রধান বাইবেল হিসেবে স্বীকৃত। এই টেক্সট (মূলপাঠ)-কে নির্ভুলভাবে সংরক্ষণ করার জন্য বিশেষজ্ঞরা যে পরিশ্রম করেছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। যদিও মাসোরেটিক টেক্সটের নির্ভুলতা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই, তবুও গবেষকরা মনে করেন যে, বাইবেলের প্রতিটি বইয়ের ক্ষেত্রে এই টেক্সট (মূলপাঠ)-এর মান সমান কি না, তা আলাদাভাবে যাচাই করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, যাত্রাপুস্তক (Exodus)-এ এটা খুব প্রাচীন ও নির্ভুল রূপ ধরে রাখলেও, স্যামুয়েলের বইগুলোতে এর কিছু ভিন্নতা দেখা যায়।"[1]

১.১.২ সেপটুয়াজিন্ট (LXX)

"খ্রিস্টপূর্ব শেষ তিন শতাব্দীতে ইহুদি পণ্ডিতরা হিব্রু বাইবেলের বইগুলোকে গ্রিক ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন, যা সেপটুয়াজিন্ট (LXX) নামে পরিচিত।এই অনুবাদের কাজ ঠিক কবে শুরু হয়েছিল, তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। তবে প্রচলিত আছে যে, রাজা দ্বিতীয় টলেমি ফিলাডেলফাসের শাসনামলে ফিলিস্তিন থেকে ৭২ জন পণ্ডিত মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় গিয়ে মাত্র ৭২ দিনে আইনের বইগুলো গ্রিক ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।"

"খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দের দিকে গ্রিক অনুবাদের কিছু উদ্ধৃতি পাওয়া যায়, যার মানে হলো – এই অনুবাদ প্রক্রিয়া তার আগেই শুরু হয়েছিল।সেপটুয়াজিন্ট-এর প্রাচীনতম রূপটিকে 'ওল্ড গ্রিক' বলা হয়, যা পরবর্তীতে হিব্রু টেক্সট (মূলপাঠ)-এর সাথে মিল রেখে কয়েকবার সংশোধন করা হয়েছে।

[1] জেমস সি. ভ্যান্ডারক্যাম, "Texts, Titles, and Translations," in The Cambridge Companion to the Hebrew Bible/Old Testament, ed. Stephen B. Chapman and Marvin A. Sweeney (New York: Cambridge University Press, 2016), 9-10।

মজার বিষয় হলো, সেপটুয়াজিন্ট-এর কিছু পাণ্ডুলিপি মাসোরেটিক টেক্সটের প্রাচীনতম অনুলিপিগুলোর চেয়েও পুরনো। এটা হিব্রু উৎস থেকেই অনূদিত হয়েছিল, কিন্তু সব ক্ষেত্রে সেই হিব্রু টেক্সট (মূলপাঠ)-কে নিশ্চিতভাবে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।"[1]

১.১.৩ তারগুমসমূহ

"'তারগুম' শব্দটির অর্থ হলো অনুবাদ। দ্বিতীয় মন্দির যুগে ইহুদি সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে আরামীয় ভাষা খুব প্রচলিত ছিল, তাই তারা হিব্রু বাইবেলের বইগুলোকে আরামীয় ভাষায় অনুবাদ করেছিল। তারগুমের শুরুর দিকের ইতিহাস সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য না পাওয়া গেলেও, 'মৃত সাগরের পাণ্ডুলিপি' (Dead Sea Scrolls)-র মধ্যে এগুলোর লিখিত রূপ খুঁজে পাওয়া গেছে। এটা প্রমাণ করে যে, খ্রিস্টপূর্ব সময় থেকেই তারগুমের লিখিত টেক্সট (মূলপাঠ) প্রচলিত ছিল। গুরুত্বপূর্ণ তারগুমগুলোর মধ্যে তারগুম সিউডো-জোনাথন, নিওফাইটি, ফ্র্যাগমেন্ট তারগুম, অনকেলোস এবং নবীদের জন্য 'তারগুম জোনাথন' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।"

"মূলপাঠ বা টেক্সট গবেষণার ক্ষেত্রে তারগুম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলো হিব্রু টেক্সট (মূলপাঠ)-এর ওপর ভিত্তি করেই লেখা হয়েছে। পাশাপাশি ব্যাখ্যার ইতিহাসের ক্ষেত্রেও এদের ভূমিকা অনেক, কারণ অনেক সময় তারগুমগুলো শুধু অনুবাদই করেনি, বরং মূল টেক্সট (মূলপাঠ)-কে সহজ করতে বা বুঝাতে গিয়ে সেটাকে আরও বিস্তৃত করেছে কিংবা কিছুটা ভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছে।"[2]

[1] ভ্যান্ডারক্যাম, "Texts, Titles, and Translations," 10-12।
[2] ভ্যান্ডারক্যাম, "Texts, Titles, and Translations," 13-14।

১.২ বর্তমান কাজের কাঠামো

ইশাইয়া ৪২-এর এই গবেষণায় আমরা মাসোরেটিক টেক্সট (MT), সেপটুয়াজিন্ট (LXX) এবং তারগুম জোনাথনের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করব।আমরা মূলত এমন কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য বা ভিন্নতার দিকে নজর দেব, যা টেক্সট (মূলপাঠ) বোঝার ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের এই গবেষণায় প্রামাণিক হিব্রু পাঠ্য হিসেবে এমটি (MT)-কে প্রধান উৎস হিসেবে ধরা হবে। পাশাপাশি এলএক্সএক্স (LXX)-এর মাধ্যমে আমরা ভিন্ন একটি টেক্সট ঐতিহ্যের পরিচয় পাব এবং তারগুমের মাধ্যমে দ্বিতীয় মন্দির যুগে ইহুদিরা কীভাবে বাইবেলের পাঠ ও অর্থ গ্রহণ করত, তা বোঝার চেষ্টা করব। এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টির বিশ্লেষণকে আরও সমৃদ্ধ ও গভীর করতে আমরা এই উৎসগুলোকে সতর্কতার সাথে সমন্বয় করব।

সাহিত্য : কবিতা

জাভেদ আহমেদ গামিদি

رازداں

(রাজদাঁ: গোপন রহস্য)

فضا خموش، سوادِ فلک ہے تیرہ و تار
کہ لٹ گئی ہے کہیں آبروئے چرخِ بریں
نگاہِ قلب کے تاروں میں اختلالِ سرود
مرے وجود میں شاید مرا وجود نہیں

ফিজা খামোশ, সাওয়াদ-এ-ফালাক হ্যায় তেরা ওঁ তার।
কেহ লুট গায়ি হ্যায় কাহিন আবরু-এ-চারখ-এ-বারিন।
নিগাহ-এ-কাল্ব কে তারোঁ মেঁ ইখতিলাল-এ-সারুদ।
মেরে ওয়াজুদ মেঁ শায়াদ মেরা ওয়াজুদ নেহিঁ।

হাওয়া নিস্তব্ধ, আকাশের বিস্তৃতি ধূসর অন্ধকার,
মনে হয় যেন কোথাও লুণ্ঠিত হয়েছে উঁচু আকাশের মর্যাদা।
হৃদয়ের দৃষ্টির তারগুলোতে আজ সুরের ছন্দপতন ঘটেছে,
আমার অস্তিত্বের মাঝে হয়তো কোনো অস্তিত্ব নেই।

شروعِ وادیِ کاغان میں مقامِ چنوں
مقامَ حاصلِ ایماں، مقامِ الّا ہو
مری حیاتِ پریشاں کی رفعتوں کا مقام
مری قبائے دریدہ کی آرزوئے رفو

শুরু-এ-ওয়াদি-এ-কাগান মেঁ মুকাম-এ-চুনোঁ।
মুকাম-এ-হাসিল-এ-ইমাঁ, মুকাম-এ-ইল্লা হু।
মেরি হায়াত-এ-পারেশাঁ কি রিফাতোঁ কা মাকাম।
মেরি কাবা-এ-দারিদা কি আরজু-এ-রাফু।

কাগান উপত্যকার ‘চুনোঁ’ নামক স্থানটি,
যেন ঈমানের এক ধাম, ‘ইল্লা হু’- এর আধ্যাত্মিক ভূমি।
এটি আমার বিপর্যস্ত ও ব্যাকুল জীবনের সুউচ্চ শিখরের স্থান,
এটি আমার জীর্ণ পোশাকের তালি দেওয়ার শেষ আকাঙ্ক্ষা।